শিল্প-লিপি

শিল্প-লিপি

ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা

অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত,

বন্ধুবরেষু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

অধ্যয়ন ও আলোচনা প্রসঙ্গে সম্প্রতি কতকগুলি শিল্প-জিজ্ঞাসা মনে অনুভব করিয়াছি; সেই জিজ্ঞাসাগুলিকে অবলম্বন করিয়া মনে যে সকল চিন্তা জড় হইয়াছে তাহাই কতগুলি প্রবন্ধাকারে সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধগুলিকে একসঙ্গে করিয়া দেখিলাম, সকল বক্তব্যের ভিতরে বেশ একটা যোগ রহিয়াছে; শিল্প-ধর্মের বিশেষ বিশেষ দিক্ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া শিল্প-ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ ধারণাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে; তাই এগুলিকে এখানে একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। লেখাগুলি সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাসিক বসুমতী, উজ্জ্বল ভারত, পুনশ্চ প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, মাসিক বসুমতীতেই বেশী। এখানে অবশ্য লেখাগুলির ভিতরে অনেক পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হইয়াছে। বন্ধুবর শ্রীযুত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের তৎপরতায়ই বইখানি শোভনভাবে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে; এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বৈশাখ, ১৩৫৮

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

অভিধান বনাম অন্বয়

কিছুদিন পূর্বেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে আমরা খুব বড় করিয়া দেখিতাম। তাহার পিছনে ছিল একটা ব্যাপক বিশ্বাস। আমরা ভাবিতাম, ব্যক্তি আপনাতেই আপনি পূর্ণ না হইলেও তাহার মূল্য স্ব-তন্ত্র,—অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ। একটি আত্ম-সম্পূর্ণ অর্থ লইয়াই সকল ব্যষ্টি পরস্পরে মিলিত হইয়া একটি সমষ্টি-সত্তা লাভ করে, ইহাকেই আমরা বলি সমাজ। সমাজ-সত্তার অর্থ তাই প্রায় সবটাই নির্ভর করে 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-সত্তার উপরে এবং ব্যক্তি-সত্তার অর্থের টুকরাগুলি একত্র যোগ করিলেই মিলিবে সমাজের অর্থ।

কিন্তু এখন মনে সংশয় আসিয়াছে,—চিন্তারও ধারা বদলাইয়াছে। এখন আবার যে বিশ্বাসটা মনকে বেশী করিয়া পাইয়া বসিতেছে তাহা এই—আমাদের সমাজ-সত্তাটাই আগের কথা, ঐটাই আসল, ব্যক্তির সত্তা পরে। সমাজই অংশী, ব্যক্তি অংশ। সমাজের একটা অখণ্ড সত্তা এবং অর্থ আছে। সেই অখণ্ড সত্তা এবং অর্থের সঙ্গে নিবিড় যোগেই আমরা লাভ করি আমাদের ব্যক্তি-পুরুষের অর্থ এবং মহিমা।

প্রশ্নটা তাহা হইলে মোটামুটি গিয়া দাঁড়ায় এই—আমাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কি একটি অন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অর্থ বা অভিধান আছে, না আগে আমরা একটা বৃহত্তর সমাজ-জীবনে নিবিড়ভাবে যুক্ত বা অন্বিত হই এবং সেই অন্বয়ের ভিতর দিয়া আমাদের ব্যক্তিগত অর্থ বা অন্বয় ফুটিয়া বাহির হয়। আরও সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমরা আগে অভিহিত হই, তারপরে পরস্পর অন্বিত হই, না আগে

পরস্পরে অন্বিত হই এবং সেই অন্বয়ের যোগে প্রকাশ পায় আমাদের ব্যক্তিগত অভিধান।

এই প্রশ্নটিই আশ্চর্যভাবে দেখা দিয়াছিল আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-বিচারকগণের মধ্যে শব্দ ও বাক্যের অর্থ-নির্ধারণে। এক দলের মত ছিল এই, এবং আজ পর্যন্তও আমাদের মধ্যে এইটাই প্রচলিত বিশ্বাস যে, প্রতিটি শব্দের একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে, সেই শক্তিবলেই সে স্বাধীনভাবে নিজের অর্থ প্রকাশ করে। একটি বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা যে তাহার একটি অখণ্ড অর্থ দেখিতে পাই, তাহা আর কিছুই নহে, তাহা প্রতিটি শব্দের যে স্বতন্ত্র অর্থ তাহারই সমবায়ে গঠিত। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তির বন্ধনে যখন কতকগুলি স্বতন্ত্র শব্দ গ্রথিত হয় তখনই তাহারা একটি বাক্য রচনা করে; এই বন্ধনের ফলে শব্দগুলির ভিতরে যে একটি অন্বয় সাধিত হয় তাহারই ফলে জাগে বাক্যের অখণ্ড অর্থ। অপর দল বলেন ঠিক ইহার বিপরীত কথা; অর্থাৎ একটি বাক্যের ভিতরে কোন শব্দই একেবারে স্বতন্ত্রভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করে না; তাহারা প্রথমে পরস্পরে অন্বিত হয় এবং সেই অন্বয়ের ভিতর দিয়াই তাহারা খুঁজিয়া পায় তাহাদের নিজ নিজ অর্থ। তাহা হইলে দাঁড়াইল গিয়া সেই একই প্রশ্ন, বাক্যের ভিতরে শব্দগুলি প্রথমে অভিহিত হইয়া অন্বিত হয়, না, প্রথমে অন্বিত হইয়া পরে অভিহিত হয়। প্রথমোক্ত দলের নাম অভিহিতান্বয়বাদী, দ্বিতীয় দলের নাম অন্বিতাভিধানবাদী।

বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে এই দুই মতবাদের ভিতরে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা ইহা লইয়া বচসাই চলিতেছে,—আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারি নাই। হয়ত ইহার কোনটাই একক সত্য

নহে। কিন্তু তথাপি আজকাল আমাদের ঝোঁক সমাজতন্ত্রবাদের দিকে। বৃহত্তর জীবনের এই সমাজতন্ত্রবাদই সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপ-ধারণ করিয়াছে অন্বিতাভিধানবাদে। গদ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ প্রবন্ধাদির বেলায়, সংশয়ের অনেক অবকাশ রহিয়াছে; কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষপাতিত্ব অন্বিতাভিধানবাদেরই দিকে।

আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকগণের মনকে এ-প্রশ্নটি নাড়া দিয়াছে বিশেষভাবে এবং এই জন্য শব্দের 'অর্থ' সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন। এই সকল গবেষণার পরে তাঁহারা যে রায় দিয়াছেন, সাধারণভাবে তাহাও এই অন্বিতাভিধানবাদেরই পক্ষে। তাঁহারা বলিয়াছেন, একটা শব্দের 'অর্থ' বিশেষভাবে নির্ভর করে তাহার অন্বয়ের (context) উপরে। এই 'অন্বয়' কথাটির ভিতরে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এই অন্বয় শুধু বাক্যগত শব্দগুলির ভিতরে একটা পরস্পর-সম্বন্ধ নহে। প্রত্যেকটি শব্দ তাহার ধ্বনির পক্ষে বহন করিয়া আনে অনেকখানি ইতিহাস; তাহার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত আছে বিশেষ প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ভিতরে একটা বিশেষ যুগের একটা বিশেষ সমাজ-জীবনের বিবর্তন। একটি শব্দ যখন অন্য একটি শব্দের সহিত অন্বিত হয় তখন সে তাহার এই সমগ্র ইতিহাস লইয়াই জড়িত হয়। দৃষ্টান্ত লইয়া কথা বলা যাক্। যেখানে বলা হইল—

'প্রেমেরি যমুনা বহিছে উজান।'—

সেখানে চারিটি শব্দের যোগে একটি বাক্যার্থের যে অখণ্ড-প্রতীতি ঘটিয়াছে তাহা কি করিয়া লাভ করিলাম? প্রথমে অভিহিতান্বয়-বাদের মত অনুযায়ী প্রত্যেকটি শব্দের স্বতন্ত্র আভিধানিক অর্থ নির্ধারণ করিয়া এগুলিকে মিলাইতে চেষ্টা করুন—কোন স্পষ্ট অর্থই

পাওয়া যাইবে না; আমার বিশ্বাস, এই শব্দগুলি ইহাদের স্বতন্ত্র আভিধানিক অর্থ লইয়া আমাদের মনের ভিতরে সুষ্ঠুরূপে অন্বিতই হইবে না। এখানে প্রতিটি শব্দের যে অর্থমাধুর্য, তাহা মুখ্যতঃ নির্ভর করিতেছে তাহাদের অন্বয়ের উপরে। সেই অন্বয়ের ভিতর দিয়া শব্দার্থও একটি সুকুমার অভিধান লাভ করিয়াছে। শুধু এই অন্বয় নয়, এখানকার ব্যবহৃত 'প্রেম' 'যমুনা' প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি তাহাদের সহিত বহন করিয়া আনিয়াছে আমাদের বিশেষ একটি সমাজ-জীবনের অনেক সূক্ষ্ম ইতিহাস; সেই ইতিহাসই ইহাদের অন্বয়কে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। এই ঐতিহাসিক অন্বয়ের জন্যই আমাদের 'প্রেমের যমুনা' হয়, 'জ্ঞানের গঙ্গা' হয়,— 'প্রেমের গঙ্গা' এবং 'জ্ঞানের যমুনা' শুধু নিরর্থক নয়, আমাদের শ্রুতিপীড়াদায়কও। উপরি-উক্ত বাক্যটির অন্তর্গত 'বহিছে উজান' কথাটির প্রতিও লক্ষ্য করুন। 'উজান বওয়া' কথাটি এখানে তাহার কোন সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই—তাহারও একটি বিশেষ অর্থ আছে, এবং সে অর্থও নির্ভর করিতেছে তাহার অন্বয়ের উপরে—তাহার বহুদিনের ইতিহাসের উপরে। আমাদের দর্শনে, ধর্মে, যোগ-শাস্ত্রে ও সাহিত্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই 'উজান বওয়া' কথাটি একটি বিশেষ অর্থ লাভ করিয়াছে; আমাদের নিকটে 'প্রেমের' সহিত 'যমুনা'রও একটি নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে; সেই যোগ বা অন্বয়ের সহিত বহু-যুগ-লব্ধ 'উজান বওয়া' কথাটির অর্থ একযোগে অন্বিত করিয়া তবে আমরা সমগ্র চরণটির একটা অখণ্ড অর্থ বোধ করি।

একটা সমাজ-জীবনের ভৌগোলিক অবস্থানের উপরেও যে কাব্যের ভিতরকার শব্দের অর্থ নির্ভর করে সে কথাটাকে আমরা হয়ত সহসা মানিব না। কিন্তু যুক্তির ভিতরে সেরা যুক্তি দৃষ্টান্ত—

তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। পদকর্তা গোবিন্দদাস চৈতন্য-দেবের ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥

ইহার ভিতরে চিত্রবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যেটুকু অর্থ, তাহা অখণ্ড। অখণ্ড বলিবার তাৎপর্য এই, ইহার অর্থকে প্রথমে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ ভাগ করিয়া দেখিয়া পরে জুড়িয়া এক করা যায় না। সবটা জুড়িয়া এক হইয়া অবিভাজ্যরূপে একটি বিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করিয়াছে, সেই অবিভাজ্য এক অংশীর অংশরূপেই প্রত্যেকটি কথার সার্থকতা। এখানকার অখণ্ডতা শুধু রেখাবদ্ধ চিত্রের নহে; এখানে চিত্রের সহিত শব্দ, বর্ণ, গন্ধ সবই একত্র যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। শ্রাবণের ঘনবর্ষণের শব্দস্মৃতি, মেঘকজ্জল দিবসের পটভূমিকায় বিকশিত কদম্বের শুভ্রদ্যুতি, এবং তাহার মকরন্দের গন্ধ—সব মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাহার পরেই আসিবে সমাজ-জীবনের সহিত ইহার অন্বয়ের প্রশ্ন। এই পংক্তিগুলির অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন শুধু সেই মানুষ যে মানুষের একটি বিশেষ দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রহিয়াছে,—যে দেশে শ্রাবণের ঘনকৃষ্ণ মেঘ হইতে অবিরল ধারাবর্ষণে নীপকুঞ্জ শিহরিয়া উঠিয়া সর্বাঙ্গে মুকুলের পুলক ধারণ করে, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষের সর্বাঙ্গ জুড়িয়া ভাবাবেগে ফুটিয়া ওঠে শুভ্র ফুল, তাহার বিহ্বল মধুগন্ধে সিক্ত বায়ু হয় মন্থর। এ দৃশ্য যাহার স্মৃতিতে নাই, উপরি-উক্ত কবিতার তাহার নিকটে কোন অর্থ নাই। প্রত্যয় না হয়, কবিতাটিকে কোনও একটি প্রসিদ্ধ ইউরোপীয়

ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে উপহার পাঠাইয়া দেখুন,—আমার বিশ্বাস সে উপহার প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিবে। অনুবাদের ভিতরেই ধরা পড়ে এই সত্যটি।

রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতাটির প্রথমে শুনি,—

"বেলা যে প'ড়ে এল, জল্‌কে চল্,"—

পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,

কোথা সে-ছায়া সখি, কোথা সে-জল।

কোথা সে-বাঁধাঘাট, অশথ-তল।

ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,

কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্" ॥

* * *

কলসী ল'য়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,

বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ ধূ,

ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।

দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,

দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।

গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,

পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।

পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে

সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা ॥

এই 'জল্‌কে চল্' কথাটির ভিতরে যে একটি সকরুণ ব্যাকুলতা উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের ভারতীয় পল্লীর সমাজ-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। কথাটির সঙ্গে আমাদের কতদিনের কত

স্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। 'জল্‌কে চল্‌'-এর ধ্বনিটি সেই স্মৃতির স্ফুট অস্ফুট সূক্ষ্ম সুকুমার তারগুলিতে বিচিত্র ঝঙ্কার তুলিয়াছে। এখানে জলের প্রয়োজন শুধু জৈবিক তৃষ্ণা নিবারণ নহে; তাহার প্রয়োজন মানুষের একেলা পল্লীমনে একটি সকরুণ শীকরসিক্ত ছল্‌ছল্‌ ধ্বনি তুলিয়া দেওয়া,—মানুষের মনে অনেক দিনের পুরানো একটু সুর তুলিয়া দেওয়া। এই যে পুরানো সুর সেও পল্লীবালার মতন একান্ত কোমল, সলজ্জ, ভীরু; তাই সে একা আসে নাই; তাহার সঙ্গে আছে পড়ন্ত বেলার রঙিন আলোর শেষ আভাটুকু, আছে দীর্ঘ ছায়া, আছে ছায়াঘন অশ্বত্থতলে দীঘির বাঁধাঘাট; একটি 'একেলা গৃহকোণ', একটি 'ভীরু আনমন'। এই জলের ডাকে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইতে হইলে সে পথটি আঁকা-বাঁকা হওয়া চাই, তাহার বামদিকে থাকিতে পারিবে যে মাঠ সে একটি শূন্য মনের মতন 'সদাই করে ধূ ধূ'; ডাহিনে মাথা উঁচু করিয়া কোন বন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না, তাই আছে মাথা-হেলাইয়া-দেওয়া একটি বাঁশবন; আর আছে দীঘির কালো জল, তাহার উপরে সাঁঝের সোনালি আলো—দু'ধারে ঘন ছায়াবন, আঁধার তরুশিরে আঁকা আধফালি চাঁদ! এখানে ভাব ছন্দ শব্দ কাহারও সহিত কাহারও কোন ছাড়াছাড়ি নাই—সব জড়াইয়া একটি পুরানো দিনের সুর মনের ভিতরে ছল্‌ ছল্‌ ঢেউ জাগাইয়া দেয়।

চিত্রাঙ্কনের মধ্যে 'ল্যাণ্ড্‌স্কেপ্‌' অঙ্কন একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই ল্যাণ্ড্‌স্কেপ্‌ অঙ্কনের একটা কৌশল এই যে, তাহার ভিতরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের অঙ্কন রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই সমগ্র ছবিখানির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু সমগ্র ছবিখানি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে সেগুলির

কোনটিই তেমন সার্থক নহে। প্রতিটি টুকরা টুকরা অংশের অঙ্কনের পশ্চাতে চিত্রকরের একটি বিশেষ মানসিক অবস্থান এবং তজ্জনিত একটি ভাবদৃষ্টি রহিয়াছে। চিত্রকরের এই মানসিক অবস্থানটিই সমগ্র চিত্রখানির ভিতরে একটি গভীর অন্বয়সাধন করে যাহার ফলে প্রত্যেকটি অংশ একটি সমগ্রতার ভিতরে বিধৃত হইয়া থাকে। এই অন্বয় ব্যতীত কোন অংশেরই তেমন তাৎপর্য নাই, অথচ এই অন্বয়ের যোগে প্রত্যেকটি অংশই অর্থবান্। কবিতার ভিতরেও এই জাতীয় চিত্রধর্মী কবিতা রহিয়াছে, যেখানে সমগ্রতার সহিত অন্বিত হইয়াই প্রতিটি বর্ণনা অর্থলাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যাহ্ন' (চৈতালি) বা 'সুখ' (চিত্রা) প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা রহিয়াছে তাহার অংশগুলিকে সমগ্র বর্ণনা এবং সেই বর্ণনার পিছনকার কবির মানসিক অবস্থান এবং ভাবদৃষ্টিকে বাদ দিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করিতে গেলে সেগুলির কোনটিরই তেমন কোন একটা অপূর্ব চারুত্ব থাকে না ; সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে অভিহিত হইয়া পরে অন্বিত হয় না,— প্রথমে অন্বিত হইয়া সেই অন্বয়ের যোগেই সেগুলি অভিধান লাভ করে।

এক-একটি ভাল লিরিক্ কবিতা এক-একটি অখণ্ড বস্তু। একটি বীজ-শক্তি যেমন করিয়া নিজেকে একটি শাখাবাহুপ্রসারিত বহু-পল্লবিত এবং পুষ্পিত বৃক্ষে ছড়াইয়া দিয়া সেই সমস্ত অংশের ভিতর দিয়া বৃক্ষের একটি অখণ্ড সত্তাকে প্রকাশ করে, একটি লিরিক্ কবিতার বেলায়ও তাহাই ঘটে। কবির অন্তর্নিহিত গভীর রসানুভূতি এখানে বীজ-স্বরূপ, সেই বীজশক্তির বহিঃপ্রকাশে জাগিয়া ওঠে যত ছন্দ, শব্দ, অর্থ, যত বাগবৈদগ্ধ্য,—তাহারা তাই অখণ্ডভাবে অন্বিত। গাছের একটি পাতা বা ফুল যেমন গাছের সমগ্র সত্তা হইতে

বিচ্ছিন্নভাবে আপন অস্তিত্বকে জাহির করিতে পারে না, অথচ সমগ্রের সহিত অন্বয়ে তাহাদের ভিতরকার প্রতিটি রেখা প্রতিটি বর্ণ-বিন্দুই সার্থক, একটি ভাল লিরিক্ কবিতার সম্বন্ধেও সেই কথা। উপনিষদে বলা হইয়াছে, বিশ্বভুবনের ভিতরে যে দেব গূঢ় হইয়া আছেন—'তমেব ভান্তমনুভাঁতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—তিনি প্রকাশিত হন, তাঁহার পশ্চাতে সকল প্রকাশিত হয়, তাঁহার দীপ্তিতেই এই সকল দীপ্তিমান্। সেইরূপ একটি লিরিক্ কবিতার ভিতরে নিহিত থাকে যে রসবেদনা তাহাই কাব্যদেহের প্রত্যেক কণায় কণায় ছড়াইয়া আছে; এবং তাহার সহিত গভীরভাবে অন্বিত হইয়াই কাব্যদেহের প্রতিটি অংশ একটা সমগ্রতার ভিতরে অন্বিত হইয়া প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতাটির মূল ভাবের সহিত নিবিড় অন্বয় ব্যতীত

পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

অথবা

তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার-নিচে, কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।—

প্রভৃতির কোন অর্থ করা যায় কি?

রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়' কবিতাটি এইরূপ একটি অখণ্ড কাব্য-বস্তু। প্রথমেই বলা হইয়াছে—

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।

এখানে 'তিল ঠাঁই' কথাটির প্রতি লক্ষ্য করুন; অর্থের দিক্ হইতে এবং ধ্বনির দিক্ হইতে 'নীল নবঘনে'র সহিত যোগ না করিয়া তাহার ঠিক অর্থ পাওয়া যাইবে না; আর এই অন্বয়ের দ্বারা 'তিল ঠাঁই'-এর যে অর্থ পাওয়া যাইবে, কোন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন রাজনৈতিক সভার প্রসঙ্গে উল্লেখিত 'তিল ঠাঁই'-এর অর্থ হইতে তাহা অনেকখানি ভিন্ন। তার পরে কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বলা হইয়াছে—

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে,
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখালবালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু
পোহালে॥

প্রথমেই সংশয় আসে রাখাল বালক সারাদিনটিকে 'খোয়াল' কি করিয়া। কথাটির অর্থ লাভ করিতে হইলে পূর্বের

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের ক্ষেত জলে ভরভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে॥—

প্রভৃতির সহিত ইহাকে মিলাইয়া লউন। শেষরাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়া রাত্রি যে কখন পোহাইয়া যায় তাহা যেমন বোঝা যায় না, এই বাদল-দিনের মেঘলা অন্ধকারের ভিতরে বেলাটুকু যে কখন্ ফুরাইয়া আসিতেছে তাহাও তেমনই বোঝা যাইতেছে না; এই অর্থে 'পোহাল' কথাটিও এখানে অভিনব চারুত্ব লাভ করিয়াছে। এই বাদলাদিনের ভিতরে চারিদিকের ঘনায়মান অন্ধকারে এবং সজল হাওয়ার ভিতরে রাখাল বালকের মনও যেন কেমন উদাসীন উন্মনা হইয়া গিয়াছে,—সে আজ ভাল করিয়া মন দিয়া মাঠে গরু চরাইতে পারে নাই—বনে-বাদাড়ে অকারণে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেমন অকাজে যেন দিনটাকে কাটাইয়া দিয়াছে। এই অন্বয়ের সহিত রাখাল বালকের 'দিন খোয়ালে' কথাটাকে গ্রহণ করুন, তবেই তাহা সার্থক, নতুবা তাহার অর্থ আবিষ্কার করা শক্ত হইবে। তেমনি করিয়াই

ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ঐ বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ্ চাহি রে।

ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে ॥—

প্রভৃতি সমগ্র বাদলাদিনের বর্ণনাটির সঙ্গে এক করিয়া না দেখিলে তাহার তাৎপর্যও আমরা একেবারেই হারাইয়া ফেলিব।

রবীন্দ্রনাথের ‘দিনশেষে’ কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকের পৃথক্ পৃথক্ রূপে কোন অর্থ করা যায় কি ?

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বনশয়নে,
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া,
পাতাগুলি গতিহারা,
পাখি যত ঘুমে সারা কাননে—
শুধু এ সোনার সাঁঝে
বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে ॥—

ইহার পিছনে নিজস্ব কোন গভীর তত্ত্বব্যাখ্যা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কবিতাটির সমগ্রতার সহিত অন্বিত হইয়া ফল-শ্রুতিতে সে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। জীবনের ‘দিনশেষে’ যে নূতন দেশের সঙ্গে আবার পরিচয় ঘটিবে, সেখানেও দেখিতে পাইব—একই নিত্যমায়াময়ী নূতন জীবনে নূতন মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়াছে। পুরাতন জীবনের স্থির নিস্তব্ধ সন্ধ্যার পটভূমিতে নূতন লীলার মোহিনী আকর্ষণই এখানে শুধু ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, এ-ধ্বনির যোগ সমগ্রতার সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি লইয়া সমালোচক-মহলে তর্ক রহিয়াছে। সে তর্ক ঘনীভূত হইয়া ওঠে রবীন্দ্রনাথের নিজের দেওয়া একটি তত্ত্ব-ব্যাখ্যা লইয়া; কারণ এই গুরুভার নিরেট তত্ত্বটিকে ঐ কবিতাটির নমনীয় দেহে চাপাইতে আমাদের একটু কষ্ট হয়, বুদ্ধিতেও হৃদয়েও। আসলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ঐ কবিতাটি পাইয়াই আমাদের খুশি থাকা উচিত ছিল, জোর করিয়া কবির নিকট হইতে আবার ঐ তত্ত্ব-ব্যাখ্যাটি নিষ্কাসিত করিয়া আমরা ভাল করি নাই। এখানে তত্ত্বভাবনা যদি কিছু থাকিয়া থাকে তবে তাহা সমগ্র কবিতার সহিত অভিন্নভাবে যুক্ত হইয়া আছে,—তাহাকে পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করিতে যাওয়াই ভুল। এখানে আছে বাঙলাদেশের ঘনবর্ষার রূপ, কানায় কানায় বর্ষার জলে ভরিয়া যাওয়া শ্যামল মাঠ ঘাট, মাঝখানে প্রবাহিতা খরস্রোতা নদী, আকাশে কালো কালো মেঘের ঘটা, তাহাদের গুরুগুরু গর্জন, আকাশের নীচে মাঠ ঘাট ঘন সবুজ—পরপারে 'তরুছায়ামসী-মাখা'—সব জুড়িয়া চারিদিকে একটা আব্‌ছা কালিমার বিস্তৃতি—তাহারই ভিতরে ভরাপালে চলিয়াছে সোনার তরী। কবি এখানে পাঠকের চোখে যেমন গাঢ় সবুজ বাঙলাদেশের মেঘকজ্জল দিবসের অঞ্জন লাগাইয়াছেন, কানে তেমনই মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি, খরস্রোত জলের কলধ্বনি এবং সঙ্গে মাঝি-মাল্লার বাদলাদিনের গানের সুরের সঙ্গে তাঁহার ছন্দের একটা করুণ সুর মিশাইয়া দিয়াছেন। এই চোখের রঙ, কানের সুর প্রভৃতি বাদ দিয়া এখানে শুধু মাত্র একটি তত্ত্ব-গ্রহণের চেষ্টা একান্ত অপচেষ্টা। এখানকার ধান এবং তরীও যে শুধু তত্ত্বের দৈব পদস্পর্শেই সোনা হইয়া গিয়াছে তাহা মন মানিতে চায় না; বাঙালীর কাছে বাঙলার মাঠের ধান স্বভাবতঃই সোনার

ধান ; তরীখানির স্বর্ণত্বলাভের ভিতরে এই বাঙলার সোনার ধানের স্পর্শও হয়ত কিছু লাগিয়া আছে।

অনেক স্থানে দেখিতে পাইব, অন্বয় ব্যতীতও কাব্যাংশের একটা অর্থলাভ ঘটে বটে, কিন্তু অন্বয়ের দ্বারা সেই কাব্যাংশের পটভূমিকা রচিত হইলে সেই বাক্যাংশের এতখানি অর্থ-সম্প্রসারণ ঘটে যে, তাহার তুলনায় পূর্ববর্তী অনন্বিত অর্থটি একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। আমি একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি—

আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত—
মোর জীবনের রাখাল ওগো,
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে॥

পংক্তিগুলির অর্থ বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না এবং সে অর্থ যে একেবারেই চারুত্ববর্জিত তাহাও নহে ; বিরাগী ভক্তের প্রপত্তিমূলক আর্তি হিসাবে ভালই লাগে। কিন্তু ইহার পিছনে একটি পটভূমিকা রচনা করিয়া লউন—

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্যতারা দলে দলে ;
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু,
চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা ;
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে॥—

দেখিবেন মুহূর্তে একটা বিশ্বসংগীতের পটভূমিকার উপরে পূর্বোক্ত পংক্তিগুলির অর্থ কি ব্যাপক মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রসিদ্ধ কবি এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতার দৃষ্টান্ত না লইয়া একটা সাধারণ গ্রাম্য ছড়ার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি—

আম ফলে থোকা থোকা তেঁতুল ফলে বাঁকা।
ছাওয়াল সূজ্জাই বিয়া করে মায়ের ঝোলায় টাকা॥

ছাওয়াল সূজ্জাই যে বিবাহ করিতেছে এবং তাহার মায়ের ঝোলায় যে টাকা রহিয়াছে তাহার সহিত থোকা থোকা আম ফলিবার এবং বাঁকা বাঁকা তেঁতুল ফলিবার সম্পর্ক কি? উপরের পংক্তিতে যে প্রাকৃতিক বর্ণনাটুকু পাইলাম তাহার সার্থকতা কোথায়? সার্থকতা নিম্নের বর্ণনায় জীবনের যে ছোট ছবিটি রহিয়াছে তাহারই জন্য একটি পটভূমিকা রচনায়। আমের সময় আসিলে যেমন করিয়া থোকা থোকা আম ফলে, তেঁতুলের সময় আসিলে যেমন বাঁকা বাঁকা তেঁতুল ফলে, শৈশব পার হইয়া কৈশোরে পা দিতে সূর্যঠাকুরের মাও তেমনই ঝোলায় টাকা লইয়া পুত্রের বিবাহ করাইয়া ঘরে ছোট্ট বউ আনিতেছেন। উপরের ঘটনা দুইটি যেমন সহজে স্বচ্ছন্দে ঘটিয়া যায়, নীচের ঘটনাটিও যেন তেমনই একই সহজ প্রাকৃতিক ছন্দে ঘটিয়া যাইতেছে। গ্রাম্য কবির এই একটি আঁচড়ে যে পটভূমিটি রচিত হইল, তাহাতে একদিকে প্রকৃতির জীবনযাত্রার সহিত মানুষের জীবনযাত্রার যেমন একটি সহজ মিলন আভাসিত হইয়া উঠিল তেমনই মানুষের জীবনের এই সাধারণ ছোট্ট ঘটনাটিও একটা মমতামাখা স্নিগ্ধতা লাভ করিল। বেশী কথা নয়, শুধু দুইটি গাছ ও কয়েকটি ফলের ছবি।

কবিতার ভিতরে আমরা ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করি। এই ছন্দ-

গ্রহণেরও একটা প্রধান কাজ কবিতার অন্তর্গত সমস্ত শব্দের টুকরাগুলি এবং তাহার সহিত সকল অর্থগুলিকে একটা গভীর ঐক্যের ভিতরে বাঁধিয়া একটি অখণ্ড রসানুভূতির দিকে আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করা। ছন্দ-তত্ত্বের মূলেও রহিয়াছে সঙ্গীত-তত্ত্ব। সঙ্গীতের ভিতরে কি দেখিতে পাই? সেখানে কথাগুলি যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবেই প্রধান হইয়া কেবল কথা বলিতে থাকে তবে তাহা আর যাহাই হোক, সঙ্গীত হয় না। সেখানে প্রতিটি শব্দের অর্থ এবং ধ্বনি-সম্পদ্ এইরূপ একটি সুরের সহিত গভীরভাবে অন্বিত হইয়াই একটি সঙ্গীতের সমগ্র ফলশ্রুতি দান করে। সঙ্গীতের ভিতরে প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি ধ্বনির যেটুকু মূল্য তাহা সঙ্গীতের এই অখণ্ড ফলশ্রুতিরই যোগে।

ছন্দের আশ্রয়ে কবিতাও কম-বেশী সঙ্গীতধর্মী। এই সঙ্গীতধর্ম যে-সকল কবিতায় প্রধান হইয়া ওঠে, সুরের সহিত অন্বয় না করিয়া সেখানে সর্বদা শব্দের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যেমন, ধরা যাক্ গোবিন্দ দাসের সুপ্রসিদ্ধ রাসের পদ—

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লি[১] মালতী যুথি
মত্ত-মধুপ[২] ভোরণি।
হেরই[৩] রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত চোরণি॥—

১ মল্লিকা—পাঠান্তর। ২ মধুকর—পাঠান্তর। ৩ হেরত—পাঠান্তর।

এখানে 'ভোরণি' শব্দের অর্থ কি? টিপ্পনীকার পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন, 'ভোর' (বিহ্বল, মত্ত) শব্দ হইতে 'বিহ্বলতা' অর্থে 'ভোরণি' শব্দ হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থে 'নি'-প্রত্যয়ের ব্যবহার আর কেহ কোথাও লক্ষ্য করিয়াছেন কি? 'ভোরণি'কে 'ভোলনি' কথারই রূপান্তর রূপে গ্রহণ করিলেও পদটির অন্বয়ে অসুবিধা ঘটে। আমাদের মনে হয়, সমস্ত কবিতাটি জুড়িয়া অনুকূল ধ্বনির আশ্রয়ে একটা সুরের মূর্ছনা লীলায়িত হইয়া চলিয়াছে; সেই সুরের সহিত গভীর ভাবে অন্বিত করিয়া, মত্ত ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনির সহিত যুক্ত করিয়া এই শব্দটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে 'চোরণি' শব্দের 'নি'-কারও সেই সুরের অন্বয়েই সার্থক।

আমি আরও দুই-একটা অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত লইতেছি। এই সঙ্গীতধর্মের সহিতই যুক্ত কাব্যের শব্দালঙ্কার। এই শব্দালঙ্কারের প্রতি আমাদের অনেক সময়ে একটা সুরুচিগর্ভ অবজ্ঞা রহিয়াছে। কিন্তু অতি সাধারণভাবে প্রযুক্ত শব্দালঙ্কারও কাব্যার্থের প্রকাশে অনেক সময়ে কিরূপ অপরিহার্য হইয়া ওঠে তাহার সাধারণ দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গোবিন্দদাসের একটি অভিসারের বর্ণনা—

তহিঁ অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥—

এখানে 'বারি কি বারই' হইতে 'বারই' শব্দের পরিবর্তে বারণ করা, অর্থাৎ নিবারণ করা অর্থে অন্য একটি শব্দের ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন। প্রথম চরণে রহিয়াছে 'ত', 'দ', 'র', 'ল'-এর অবলম্বনে ঘন বর্ষার শ্রৌত রূপটি; এই বর্ষণধ্বনির ভিতরে আছে একটা অসহৃদয়তা, ইহার ভিতরে শ্রীরাধিকার সম্বল রহিয়াছে শুধু

মাত্র 'নীল নিচোল'—বড়ই কোমল এবং তরল ; অতএব এমনতর অবস্থায় কবির 'বারি কি বারই' ছাড়া কি কিছু আর বলিবার ছিল ? তারপরে কবি বলিলেন—

দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥—

এখন দেখা যাক্, 'দামিনী' কথাটার আভিধানিক অর্থ কি। সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে, 'দাম' অর্থ পর্বত ; এই পর্বতের সহিত যুক্ত, অর্থাৎ পর্বতাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সহিত যুক্ত বলিয়া 'বিদ্যুৎ' দামিনী[৪]। বোধ হয় সংস্কৃত 'দামন্' শব্দের সহিতও ইহার কিছু যোগ থাকিতে পারে। 'দামন্' শব্দের এক অর্থ 'দড়ি' ; বিদ্যুতের সহিত দড়ির আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। দামন্ শব্দের আর এক অর্থ মালা ; যেমন বিদ্যুদ্দাম ; এই দামন্-ই কি বিদ্যুতের সহিত যুক্ত হইয়া পরবর্তী কালে বিদ্যুৎ অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে 'দামিনী' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ? (এই ক্ষেত্রে আবার বিদ্যুৎ অর্থে প্রাচীন 'সৌদামিনী' শব্দটি লক্ষণীয়।) 'দামন্' অর্থ 'মেখলা'ও হইতে পারে, বিদ্যুতের সহিত মেখলাবতী নারীর ভাবানুষঙ্গযোগ রহিয়াছে। ইহার কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা তাহার বিচারের ভার আপাততঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া ছন্দের সুরের সাহায্যে এই 'দামিনী' কথাটিকে প্রথমের 'দশ দিশ' এবং পরের 'দহন বিথার'এর সহিত মিলাইয়া দিন, দেখুন অন্ধকার 'যামিনী'র বুকে এই 'দামিনী'কে দেখিয়া শুধু লোচন নহে, শ্রবণও উচ্চকিত হইয়া ওঠে কি না।

শব্দধ্বনির দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া বক্তব্য বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব প্রকাশ

৪ দামা সুদামা নগঃ স একদেশত্বেন অস্ত্যাস্য ইনি ঙীপ্।

করা বৈষ্ণব কবিদের—বিশেষ করিয়া গোবিন্দদাসের—একটি প্রিয় রীতি ছিল। যেমন—

যো পদতল থল- কমল সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি
আওত যাত নিশঙ্ক॥

এখানে ক, ত, থ, দ ও ল-এর সমাবেশে পদতলের যে কোমলতা প্রকাশ পাইল, কণ্টক এবং সঙ্কটময় বাটের 'ট'কারের দ্বারা তদ্বিপরীত দুরধিগম্যতাই প্রকাশ পাইল। দিবাভিসারের সময় প্রকৃতির এই রূঢ়তার সম্মুখে অসহায়তা শুধু রাধিকার নয়, কৃষ্ণেরও। তাই ঘনশ্যামদাস বলিয়াছেন,—

গরজয়ে গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
ঐছে সময়ে চলু নন্দকিশোর॥

ঘোষবৎ 'গ' এবং 'ঘ'-এর ঘনগর্জনের মধ্যে 'নন্দকিশোর'-এর অসহায়তা কানে শুনিয়াই বোঝা যায়।

একটি শব্দের নিজস্ব ধ্বনি এবং আশেপাশের ধ্বনিগুলির সহিত তাহার সঙ্গতি, শব্দের অর্থ-নির্ধারণে যে কতখানি মুখ্য হইয়া ওঠে তাহার দু'একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঙলা 'দাদুরী' কথাটির সমার্থক 'বেঙ' বা 'ভেক' কাব্যে সর্বদাই রহিল অপাংক্তেয়, কিন্তু কাব্য-সামগ্রীর সম্মান লাভ করিল 'দাদুরী' তাহার ধ্বনি-মাধুর্যের জন্য। শুধু তাহার নিজস্ব ধ্বনি-মাধুর্যের জন্য নহে,—সমস্ত পারিপার্শ্বিকতার সহিত তাহার গভীর অন্বয়ে। বিদ্যাপতি যেখানে গাহিলেন—

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥—

সেখানে দাদুরী 'বেঙ' বা 'ভেক' নামক কোনও কদাকার প্রাণি-বিশেষ মাত্র নহে; সেখানে ঘনবর্ষার ধারাসার, মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি, বজ্রের গর্জন, কেকা-কলরব, দশদিক্ ব্যাপিয়া ঘোর-তিমির-রজনী, বিরহের বুকফাটা বেদনা—সেখানকার ছন্দ, শব্দ-ঝঙ্কার—সমস্তের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দাদুরী একটি সুরময় দেহ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কাব্যে যেখানে দাদুরীকে স্থান দিয়াছেন, সেখানেও তাঁহাকে এইরূপ একটি আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে—

যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমাল-কুঞ্জ-তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।—

এখানেও এই দাদুরীকে ঘিরিয়া একদিকে যেমন রহিয়াছে ঘনবর্ষার রজনী, তমালকুঞ্জের তিমির, তাহার ভিতরে যূথীপরিমলবাহী সজল সমীর—অন্যদিকে কুসুম-পরাগের মত ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শব্দালঙ্কারের ঝঙ্কার।

কাব্য-কবিতায় শব্দের এই ধ্বনিগত অন্বয়ের প্রয়োজনটি অনেক সময় আমাদের নিকট এমন বড় হইয়া দেখা দেয় যে, তাহার খাতিরে একটু আধটু ব্যাকরণ-'দুষ্টি'কে আমরা মানসিক তুষ্টির সঙ্গেই গ্রহণ

করি। রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার প্রথমে দেখিতে পাই,—

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার।

এখানে 'দুর্দাম' কথাটি প্রবল আবেগে সত্যই ব্যাকরণের 'দম'কে অস্বীকার করিয়াছে। না করিয়া বোধ হয় উপায় ছিল না। নামি আসে আসন্ন আষাঢ় এবং মহানদ অকস্মাৎ দুর্বার প্রভৃতি আগে পাছে হইতে এমন 'আ'-এর বেগ দিয়াছে যে 'দুর্দম'ও কিঞ্চিৎ শিষ্টাচার ভাঙিয়া 'দুর্দাম' হইয়া উঠিতে বাধ্য হইয়াছে।

'দুঃসময়' কবিতায় কবি বলিয়াছেন,—

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম-রঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।

এখানেও 'সাগরে'র সহিত মিলিয়া মিশিয়া সাধু 'অজগর' তাহার অসাধু (অশুদ্ধ চলিত) 'অজাগর' রূপটিকেই গ্রহণ করিতে অধিক উৎসাহী হইয়াছে।

ব্যাকরণ-শুদ্ধির প্রশ্ন যখন আসিয়া পড়িল, তখন আর একটি গ্রাম্য ছড়ার দৃষ্টান্ত লইতেছি—

ওপারেতে কালো রঙ।
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্॥
এপারেতে লঙ্কা গাছটি লাল টুকটুক করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে॥

ব্যাকরণ-মতে ভাইয়ের যে কোনক্রমেই 'গুণবতী' হওয়া উচিত

ছিল না এ বিষয়ে কেহ কোন সংশয় প্রকাশ করিতে পারেন না; কিন্তু তাই বলিয়া এই ছড়াটির ভিতরে 'গুণবতী' শব্দটি কাটিয়া ভাইকে 'গুণবান্' করিবার মত আর নিষ্ঠুরতা কল্পনা করিতে পারেন কি? ওপারের কালো রঙ, বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ, লাল টুকটুক লঙ্কা গাছটি এই সকলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ভাই এখানে অশ্রুসজল বোনের 'গুণবতী' ভাই-ই বটে; বোনের মনের স্নেহ-প্রীতি এবং আন্‌চান্-করা মনের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে ঐ 'গুণবতী' শব্দটি।

গ্রাম্য মাঘমণ্ডলের ব্রত-কথায় শুনিয়াছি,—

ওড়ে পাখী জোড়ে জোড়ে নদীয়ার কিনারে রে।
তোমরা নি দেখেছ আমার ছাওয়াল সূজ্জাই কোন্‌খানে॥

এই 'নদীয়ার কিনারে' নিশ্চয়ই 'ছাওয়াল সূজ্জাই'র ছায়া পড়িয়াছিল।

এই ব্রত-কথায় আরও শুনিয়াছি,—

চোখে মুখে পানি দিতে কি কি ফুল লাগে।
সরুয়া মরুয়া দু'টি ফুল লাগে॥

'সরুয়া' ফুল বোঝা গেল, সরিষা ফুল; কিন্তু 'মরুয়া' ফুলটি কি? সন্ধান করিয়া জানিয়াছি, ধান কাটা হইয়া গেলে পৌষ-মাঘ মাসে মাঠে ছোট ছোট ডাঁটে লাল লাল কুঞ্চিত ফুল ফোটে, তাহাকে বলে 'মরুয়া' ফুল। আসলে হয়ত ধ্বনিগত সম্পর্কে মাঠের ফুল, 'মরুয়া' 'সরুয়া'রই জ্ঞাতিভাই।

গ্রাম্য ছড়াগুলি সাধারণতঃ কোন সচেতন কবি-চেষ্টায় উদ্ভূত নয়, তাই অচেতন কবি-ক্রিয়ার ভিতরে শব্দগত এবং অর্থগত অন্বয়ের প্রশ্নটি যে কত প্রধান হইয়া থাকে এই ছড়াগুলিতে তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলে। একটি ছেলে-ভুলানো প্রসিদ্ধ ছড়া হইল—

আতা গাছে তোতা পাখী
ডালিম গাছে মউ।
এত ডাকি তবু কথা
কও না কেন বউ॥

প্রথমতঃ দেখিতেছি, এত প্রকারের গাছ থাকিতে 'তোতা' পাখীটি যে আসিয়া 'আতা' গাছেই বসিয়াছে তাহার কারণ ধ্বনিসাম্যের আকর্ষণ। তারপরে দেখিলাম, 'ডালিম গাছে মউ'; স্বাভাবিক ভাবে ইহার সম্ভাবনা ছিল খুব কম, কারণ ডালিম গাছে সচরাচর মধুচক্র দেখা যায় না; কিন্তু এখানে একটি বিশেষ প্রয়োজনে এই অসাধারণ ব্যাপারটিও কবিকে সঙ্ঘটিত করিতে হইয়াছে। নীচে রহিয়াছে ছোট্ট একটি অভিমানিনী বউ, অনেক ডাকিলেও সে কথা কয় না; অতএব তাহার জন্য লাল লাল ফুলফোটা ছোট্ট ডালিম গাছটির নুইয়া-পড়া ডালেই কিছু মধু সঞ্চিত করিতে হইয়াছে।

রস-বিকলনে মনোবিকলন

কাব্য-বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মোটামুটি ভাবে রসবাদেরই প্রাধান্য। এই রস বস্তুটি কি, এ-বিষয়েও আলঙ্কারিকগণ নানা ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই সব আলোচনা লক্ষ্য করিলে বেশ বোঝা যায়, তাঁহাদের দৃষ্টি সাহিত্যের বা শিল্পের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই সর্বদা সীমাবদ্ধ ছিল না; মূলে ছিল ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সহিত ভারতীয় শিল্পবাদের একটা গভীর যোগ। ইহার একটা কারণও ছিল। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের দৃষ্টি একেবারে খণ্ড ছিল না। রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি জীবনের কোন দিক্‌টাকেই প্রাচীনেরা জীবনের সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেন না, জীবনের সমগ্র পরিকল্পনার সহিত যুক্ত করিয়াই প্রত্যেকের মূল্য নির্ধারণ করিতেন। জীবনের এই যে সমগ্রতার পরিকল্পনা তাহার পশ্চাতে কতগুলি ভারতীয় অধ্যাত্ম বিশ্বাস রহিয়াছে; আমরা তাই যাহারই যখন মূল্য নির্ধারণ করিতে বসিয়াছি তখনই এই অধ্যাত্ম বিশ্বাসের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া লইয়াছি।

আমাদের রসবাদের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটিই ঘটিয়াছে। এই রসের স্বরূপ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণ যত আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে একটা কথা বেশ স্পষ্ট হইয়া ওঠে,—সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয় যে রস তাহা আমাদের আত্মানন্দেরই একটি প্রকার-ভেদ। আনন্দই আত্মার স্বরূপ; তাই যাহাতেই ঘটে আত্মার প্রতিষ্ঠা, তাহাই দান করে আনন্দ। এই আনন্দ আত্মার স্বপ্রকাশ

ধর্ম, লৌকিক জীবনের আবরণ পড়িয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় এই আনন্দের উপলব্ধি ; যাহাতে এই আবরণ ভগ্ন হয়, তাহাতেই হয় আনন্দের অবাধ প্রকাশ। সাহিত্যের কাজ, যতটুকু সম্ভব এই আবরণটুকু ভগ্ন করিয়া আত্মার আনন্দ-প্রকাশকে অবাধিত করা।

সাহিত্যের বা সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে আত্মার এই আনন্দ-স্বরূপতার প্রতিফলন আমাদের চিত্তে। সংসারের দেশ-কাল-পাত্রের বোধ এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের যে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের শত সহস্র বোধ ও বেদনা (অনুভূতি) তাহাই এক দিকে লৌকিকতার পর্দার পর পর্দার দ্বারা আমাদের চিত্তকে আবৃত করিয়া ফেলিতেছে, অপর দিকে লৌকিকতার পরিমিতত্বের দ্বারা তাহাকে নিরন্তর সঙ্কুচিত করিয়া দিতেছে ; এই আবৃতত্ব এবং পরিমিতত্বের ভিতর দিয়া নির্মল আনন্দের প্রকাশ কখনও সম্ভব নয়। একটি কবিতা পড়িয়া বা একটি গান শুনিয়া বা একখানি চিত্র দেখিয়া আমাদের যে আনন্দ হয় তাহা আর কিছুই নহে,—ঐ কবিতা, গান বা চিত্রখানির ভিতরে এমন কতগুলি ধর্ম আছে, যাহা অন্ততঃ কয়েকটি মুহূর্তের জন্য কিয়ৎ-পরিমাণে চিত্তের এই প্রাত্যহিক জীবনের পুঞ্জীভূত আবরণ অপসারিত করিয়া এবং চিত্তকে পরিমিতত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত আনন্দ-স্বরূপতাকে প্রকাশ পাইতে সাহায্য করে। এই আনন্দ-স্বরূপতার প্রকাশই আমাদের রসানুভূতি।

প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিতে বিচার করিলেই এখানে প্রাসঙ্গিক কতগুলি প্রশ্ন ওঠে। সে প্রশ্ন এই, আনন্দ যদি আত্মারই ধর্ম হয়, তবে ধর্মানন্দ, কাব্যানন্দ এবং বিষয়ানন্দের ভিতরে তফাৎ কোথায়। আনন্দ যে মূলতঃ এক, এ-কথা ভারতীয় চিন্তার ভিতরে বহু স্থানেই

প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্রতম এবং স্থূলতম বিষয়ানন্দের ভিতরেও যে সেই এক এবং অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপের 'মাত্রা'রই প্রকাশ, উপনিষদে একথা অতি স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে পার্থক্য কোথায়? এ-বিষয়ে বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, পার্থক্য দেখা দেয় প্রধানতঃ উপাধির পার্থক্যে। ধর্মানন্দ সর্বপ্রকারের উপাধি-বিনির্মুক্ত, অখণ্ড নির্মল আনন্দের স্বপ্রকাশ। এখানে হয় বলিব, চিত্তধর্ম সব লোপ পাইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু অনুভূতি তাহা চিত্তে নয়, স্বরূপাবস্থিত আত্মায়; অথবা বলিব, চিত্ত এখানে নিঃসীম এবং নিরঞ্জন,—তাহাতে প্রতিফলিত আনন্দও তাই অসীম এবং স্বচ্ছতম। কিন্তু কাব্যানুভূতি বা সাধারণ শিল্পানুভূতির ক্ষেত্রে চিত্ত কখনও সম্পূর্ণ উপাধি-বিনির্মুক্ত হইতে পারে না, সেখানে চিত্তের সঙ্গে বিষয়-সংস্পর্শ থাকিবেই। এই বিষয়-সংস্পর্শের নিমিত্ত চিত্তের যে বিভিন্ন উপাধি, তাহাই চিত্তে প্রতিফলিত আনন্দধারার ভিতরে বিভিন্ন বিবর্তন আনয়ন করে। এই উপায়েই চিত্তে অনুভূত কাব্য-রস বা শিল্প-রসের ভিতরেই আবার আট বা নয় প্রকারের প্রভেদ দেখা দিয়া অষ্টরস বা নবরসের সৃষ্টি করে। বিভাবাদিই হেতুপ্রত্যয়রূপে চিত্তের এই আনন্দধারার ভিতরে বিভিন্ন বিবর্তন সঙ্ঘটন করে। বিশ্বনাথ কবিরাজ যেখানে রস-চর্বণার ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের উদ্রেকের কথা বলিয়াছেন সেখানেও এই কথাই মনে করিতে হইবে যে এ-ক্ষেত্রে বহির্বিষয়ের সহিত চিত্তের কোন লৌকিক প্রত্যক্ষ যোগ নাই: বিভাবাদির দ্বারা চিত্তে স্থায়িভাব জাগ্রত হইবার পরে বিভাবাদি চিত্তভূমির যবনিকান্তরালে চলিয়া যায়, কিন্তু একেবারে আত্মবিলোপ করে না; ছায়া-মূর্তিতে সূক্ষ্মভাবে তাহারা চিত্তের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলে। তাহা

না হইলে, রসের অনুভূতির সময়ে আমরা যে তাহাকে করুণ, মধুর, অদ্ভুত, রৌদ্র বলিয়াই চিনিতে পারিতাম না তাহা নহে, সে যে কোন সাহিত্য বা শিল্পাশ্রিত আস্বাদন তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতাম না। আমাদের সাহিত্যরসানুভূতি একটা সম্পূর্ণ বিমূঢ় অনুভূতি নয়, তাহার ধর্মের মধ্যে একটা চিন্ময়ত্ব আছে। বিভাবাদি চেতনার পরিমণ্ডলে স্মৃতিরূপে অবস্থান করিয়া রসানুভূতিকেও অনুরঞ্জিত করিতে থাকে। এই জন্যই সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পাশ্রিত রসকে ব্রহ্মাস্বাদসমীপগ পর্যন্ত বলা চলে, ব্রহ্মাস্বাদের সহিত সম্পূর্ণ এক বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

এইবারে কাব্যানন্দ বা শিল্পানন্দের সহিত লৌকিক বিষয়ানন্দের পার্থক্যের কথা আলোচনা করা যাক্। এই প্রসঙ্গে আলঙ্কারিকগণের আলোচনার ভিতরে আমরা সাধারণতঃ দুইটি শব্দের বহুল ব্যবহার পাই, লৌকিক এবং অলৌকিক বা লোকোত্তর। এই শব্দ দুইটির অর্থ প্রথমে পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া লওয়া দরকার। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে যাহা কিছু সাধারণভাবে ঘটিয়া থাকে তাহাকেই আমরা বলি লৌকিক, যাহা আমাদের এই 'লোকের' তাহাই লৌকিক। আমাদের এই লোকটি বিধৃত হইয়া আছে কিসের দ্বারা? অসংখ্য সম্বন্ধ-শৃঙ্খলার দ্বারা। আমার জীবনে যাহা কিছু আছে তাহা আমার সহিত বিভিন্নভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই আছে ; যাহা এইভাবে আমার সঙ্গে বিবিধ বন্ধনে যুক্ত হইয়া নাই, আমার জগতে বা আমার 'লোকে' তাহার কোনও সত্য নাই। আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যখনই যাহা গ্রহণ করি তখনই অসংখ্য সম্বন্ধজালের বন্ধন আসিয়া প্রমাতা এবং প্রমাপ্য উভয়কেই আবৃত এবং সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে ; এই আবরণ ও সঙ্কোচনের ভিতরে আমাদের

পাওয়াটাও যায় ছোট হইয়া; বিষয়কে এমনি ভাবে ছোট করিয়া পাওয়ার যে আনন্দ তাহা অল্প এবং মলিন, তাহাই বিষয়ানন্দ। আমাদের সাধারণ জীবনে কোন মায়ের তাঁহার পুত্রের প্রতি স্নেহের যে আকর্ষণ তাহাকে আমরা লৌকিক বলি; তাহার কারণ, মায়ের এই যে সন্তানকে গ্রহণ তাহার ভিতরে তাঁহার দেশ-কাল, তাঁহার সমাজ, ধর্ম, নীতি, অসংখ্য সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ঈর্ষা-দ্বেষ, অনেক কামনা-বাসনা, আসক্তি, সুখস্পৃহা, স্বার্থবুদ্ধি জড়িত রহিয়াছে; এই অসংখ্য বন্ধন-শৃঙ্খলে এখানে মাও মলিন হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছেন, সন্তানও মলিন এবং ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে; এখানকার পাওয়াটা—অর্থাৎ স্নেহটাও তাই আবিল এবং অল্প। এই অল্পতা এবং আবিলতাই তাহাকে দান করিল তাহার লৌকিকত্ব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভিতরে যখন পাইলাম, মা তাঁহার শিশুটিকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন,—

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,—
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে
নূতন হ'য়ে আমার বুকে বিলসি'।

* *

নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝিনে রে,
সবার ছিলি আমার হ'লি কেমনে।

ওই দেহে এই দেহ চুমি
মায়ের খোকা হ'য়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে।

* * *

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু স'রে দাঁড়ালে।
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখবো বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু-দু'টির আড়ালে।—

সেখানে মা ও সন্তান উভয়ই নিত্যকালের এবং সর্বদেশের; এখানে সমাজ, ধর্ম, নীতি প্রভৃতির কোন প্রশ্ন নাই, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার নাই, কোন লাভ-লোকসানের খতিয়ান নাই, ছোট-বড় অসংখ্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া প্রেম আবিল বা সঙ্কীর্ণ হইয়া ওঠে নাই; এই নির্মলতা এবং ব্যাপ্তিতে বাৎসল্য-প্রেম লৌকিক বন্ধন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; ইহাকে অবলম্বন করিয়া আবরণমুক্ত চিত্তের যে আনন্দময় বিস্তৃতি তাহাই অলৌকিক বা লোকোত্তর রস। এখানে মা ও তাঁহার সন্তান এবং এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া যে বাৎসল্য-প্রবাহ তাহা আনন্দের স্বাদমানতাকে উপাধিগ্রস্ত করিয়া রঞ্জিত করিয়াছে বটে, কিন্তু গভীরতা, ব্যাপ্তি ও নির্মলতায় সে নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে। এ-কবিতায় অবশ্য মাতৃত্বের সর্বজনীনত্ব এবং সর্বকালীনত্ব—অর্থাৎ বিভাবাদির পরিচ্ছেদ-শূন্যতা অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর একটু অস্পষ্ট দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। আগমনী গানের—

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা বুঝি আমার কেঁদেছে।

অথবা বৈষ্ণব কবির—

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে ॥
ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥—

প্রভৃতির কাব্যত্ব বা শিল্পবাচকত্ব কোথায়? আশ্চর্য ভাবে কবি দৈনন্দিন বাস্তব পরিবেশের সমস্ত খুঁটিনাটির মধ্য দিয়াও একটি নিত্যলীলার আভাসে চিত্তকে মুক্তি দিয়াছেন। ধর্মের সংস্কার বাদ দিয়াও পাইতেছি সেই নিত্যলীলা, যে লীলা দেশে দেশে যুগ যুগ ধরিয়া চলিতেছে আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে, নিত্যমানবের অন্তর্নিহিত যশোদা ও বালগোপালের ভিতরে। যশোদা ও বালগোপালের এই নিত্য সর্বব্যাপী রূপই তাহাদের লোকোত্তর রূপ; তাহাদের অবলম্বনে চিত্তের ভিতরে যে আনন্দ-স্বাদমানতার উদ্বোধ তাহাই কাব্যানন্দ বা রস। অনাবিলতায় এবং প্রসারে তাহা এক দিকে

ধর্মানন্দের সমীপগ হইয়াও উপাধি-সংস্পর্শ-হেতু ধর্মানন্দ হইতে বিলক্ষণ; অপর দিকে লোকোত্তরত্ব-হেতু বিষয়ানন্দ হইতেও বিলক্ষণ। উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্'। যাহা বিরাট্ তাহাই অমৃত, যাহা অল্প তাহাই মর্ত্য। ব্রহ্মানন্দ অসীমতা ও অনন্তত্বের জন্য অমৃত, সাহিত্যের রস অমৃত না হইলেও অমৃতকল্প; আর যাহা অল্প এবং আবিল তাহাই 'মর্ত্য'— অর্থাৎ 'লৌকিক'। যাহা মর্ত্য বা লৌকিক তাহাই 'ক্ষয্য'; এই জন্য বিশ্ব-সংসারের ঘূর্ণ্যমান স্রোতে নিরন্তর কত-কিছু ঘটিতেছে, মুহূর্তে আবার তাহা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে; ইহার মধ্যে যেটুকু শিল্পরূপ লাভ করিল তাহা আর দুর্নিবার স্রোতাবর্তে লুপ্ত হইয়া গেল না, যাহা যতটা সার্থক শিল্পরূপ লাভ করিল তাহা ততটা অমৃতকল্প হইয়া রহিল।

ভারতীয় রসবাদ আমরা যেমন করিয়া বুঝিয়াছি উপরে অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার একটু আভাস দিলাম। এ-বিষয়ে ভারতীয় চিন্তার ভিতরে একটা বিশেষ ধারা ছিল এবং বিভিন্ন যুগে ভারতীয় সাহিত্য-বিচারকগণ জ্ঞানতঃ-অজ্ঞানতঃ ভারতীয় বেদান্তবাদের কাছ ঘেঁষিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এই বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতির কাঠামো অতিক্রম করিয়া এ-বিষয়ে অন্য দৃষ্টিতেও কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

রসবাদের আলোচনায় দেখা যায়, একটি কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের সকল অলৌকিক রসের অবলম্বন আমাদের চিদ্গত ভাব। লৌকিক ভাবই একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া পরিস্রুত হইয়া অলৌকিক রস-পর্যায়ে উন্নীত হয়। একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। আমাদের সাধারণ সমাজ-জীবনে

একটি সুন্দরী যুবতীকে অবলম্বন করিয়া একটি যুবকের যে হৃদয়াকৃতি তাহাকে আমরা একটি লৌকিক রতির ভাব বলিব; কারণ, তাহার চিদ্‌গত ভাব এখানে দেশ-কাল-পাত্রের পরিমিতত্বের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, দৈহিক লালসার দ্বারা ক্লিন্ন। এখানে উভয়ের আকর্ষণের মধ্যে যতখানি পরিচ্ছিন্নতা এবং ক্লিন্নতা থাকিবে প্রেম ততখানিই লৌকিক ভাবের পর্যায়ে নামিয়া আসিবে। এই ব্যাপারটিকেই কালিদাস তাঁহার শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার ভিতর দিয়া যখন রূপায়িত করিলেন, অথবা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যে যখন অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ভিতর দিয়া রূপায়িত করিলেন, তখন আমরা বলি যে লৌকিক রতি সেখানে মধুর রসে উন্নীত হইয়াছে। চিত্ত-মধ্যে এই লৌকিক ভাবের অলৌকিক রসে রূপান্তরিত হইবার প্রক্রিয়াটি কি? ইহাকে বলা হইয়াছে 'সাধারণীকৃতি'। দুষ্মন্ত ও অর্জুন এখানে কাব্যকৃতির ভিতর দিয়া শুধু দুষ্মন্ত বা অর্জুনরূপে দেখা দেয় নাই; তাহারা দেখা দিয়াছে নিখিল যুব-সাধারণের একটি নিত্যচিত্তবৃত্তির মধুরতম বিগ্রহরূপে; শকুন্তলা এবং চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধেও সেই কথা। বস্তুর এই সাধারণীকৃত রূপটি আসলে কি? ইহাকে দার্শনিক ভাষায় বলা যাইতে পারে Concrete Universal। আমরা সাধারণভাবে যখন 'মানুষে'র কথা বলি, তখন আমরা কাহার কথা বলি? কোন বিশেষ দেশের বিশেষ কালের বিশেষ মানুষের যেমন নয়, তেমনি সকল দেশ-কাল-পাত্রের অতীত সকল রূপ-গুণবর্জিত মানুষ সম্বন্ধে নিছক একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট্ আইডিয়ারও নয়। যখন 'মানুষ' সম্বন্ধে কথা বলি, তখন আমরা আমাদের চিত্রপটে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিকে অনুভব করি, এই ছায়ামূর্তি যেমন নিরাকার নয়, তেমনি নির্গুণও নয়; অতীত, বর্তমান ও অনাগত

কালের সকল মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতি মানুষের রূপ ও গুণ হইতে তিল তিল করিয়া উপজীব্য সংগ্রহ করিয়া মনের ভিতরে একটি 'মানুষ' সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এই 'মানুষে'র বাস তাই আমাদের চেতনলোকে ততখানি নয়, যতখানি আমাদের বাসনালোকে। শিল্পে রূপায়িত সাধারণীকৃত নর-নারী তাই আমাদের বাসনালোকের নর-নারী। একটি কবিকৃত শব্দ ও অর্থের ঝঙ্কার ও দ্যোতনা বা একটি চিত্রীকৃত রঙ ও রেখা যখন আমাদের গহন চিত্তলোকে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের বাসনালোকে সুপ্তা রাজকন্যাকে জাগ্রত করিয়া দেয়, তখনকার সেই মানস-প্রতিমাই হইল পুরুষচিত্তে নারীর সাধারণীকৃত রূপ। এই রাজকন্যার রূপক আসিয়া পড়িল বলিয়া এ-কথা মনে করা উচিত হইবে না যে নর-নারী সম্বন্ধে আমাদের বাসনালোকে একটি করিয়াই সাধারণীকৃত রূপ আছে, তাহা ঐ রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার রূপ। বাস্তব জগতে নর-নারীর রূপ এবং চরিত্র যেমন অনন্ত, আমাদের অন্তর্লোকেও তেমনি তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া আমাদের বাসনাধৃত রূপ অসংখ্য। পুরুষ শুধু রাম হয় না, রাবণও হয়; নারী শুধু সীতা হয় না, কৈকেয়ীও হয়। ইয়াগো, ভাঁড়ু দত্ত, লেডি ম্যাক্‌বেথ্, লহনা-খুল্লনা—আমাদের বাসনালোকে এবং আমাদের শিল্পলোকে তাহাদের কাহারই প্রবেশ-নিষেধ নাই। ভাঁড়ু দত্ত যেখানে শিল্পের সামগ্রী সেখানে ভাঁড়ু দত্ত কোনও বিশেষ দেশের বিশেষ কালের একটি লোক-বিশেষ নয়; বিশ্বমানবের চরিত্রে যে অসংখ্য সম্ভাবনা রহিয়াছে, 'ভাঁড়ু দত্ত'ত্ব সেই অসংখ্য সম্ভাবনারই একটি; মানব-চরিত্রের সেই সর্বকালিক 'ভাঁড়ু দত্ত'ত্বের বিগ্রহই হইল সাহিত্য-বর্ণিত ভাঁড়ু দত্ত মানুষটি।

মোটামুটিভাবে দেখা যায়, বহির্বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারে অন্তর্জগতে প্রবেশ লাভ করিয়া নিরন্তর একটা রূপান্তর লাভ করিতেছে। নিত্যকালের বহির্বিশ্বটির তুলনায় আমাদের অন্তর্লোকটি অনেক ছোট; মনকে স্বভাবতঃই তাই বাছাই করিতে হয়। সে তাহার রুচি-প্রবণতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতির দ্বারা বাছাই করিয়া অপরিহার্য অংশকেই গ্রহণ করে, পরিহার্য অংশকে যত সত্বর সম্ভব পরিহার করে। অপরিহার্য অংশকেও সে চেতনলোকে বেশীক্ষণ রাখিতে পারে না, সেখানে পরিসর অতি অল্প, সুতরাং স্বভাবতঃই স্থানাভাব,—তাই তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিতে হয় বৃহত্তর এবং গভীরতর চিত্তভূমিতে—মনের অবচেতনে এবং অচেতনে। সেখানে গিয়াও তাহারা স্থির হইয়া নাই,—আমাদের কর্ম-চিন্তা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণার পুটপাকে তাহারা আরও রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে; সমজাতীয় লক্ষ লক্ষ ছায়ামূর্তি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বর্জন করিয়া পরস্পর জড়িত হইয়া এক হইয়া উঠিতেছে। এমনি করিয়াই একটু একটু করিয়া তাহাদের ভিতরকার দেশ-কাল-পাত্রের স্বাতন্ত্র্য এবং পরিমিতত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে এবং সমরূপ বা সমধর্মের ঐক্যসূত্রে বিধৃত হইয়া একটা সর্বকালিক এবং সর্বজনিক ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে; এই ব্যাপ্তির সহিত যোগ দেয় ধ্যানের পুটপাকে জারিত এক নিখাদ ঔজ্জ্বল্য; এই ব্যাপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য তাহাদিগকে যে মহিমা দান করে তাহাতেই তাহারা লাভ করে শিল্পসামগ্রীত্বের অধিকার। বস্তু প্রথম যখন চিত্তভূমির চেতনলোকে প্রবেশ করিয়া তাহার সকল স্থূলতা এবং আবিলতা লইয়া একটা আলোড়নের সৃষ্টি করে, সেই আলোড়নকেই আমরা বলি লৌকিক ভাব। কিন্তু সে যখন চিত্ত-ভূমির গভীরে থিতাইয়া পড়িল, তখন তাহার আলোড়নের

আবিল প্রচণ্ডতা আপনা-আপনি স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। অনেক ধ্যান-তপস্যার ভিতর দিয়া সে তাহার মহিমোজ্জ্বল মূর্তিতে আবার যখন চেতনস্তরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল তখন চিত্তভূমিতে জাগিয়া উঠিল এক নবতম আনন্দের স্পন্দন, সেই আনন্দ-স্পন্দনই সাহিত্য বা শিল্পের অলৌকিক রস।

এই যে লৌকিক ভাবের অলৌকিক-রসপ্রাপ্তি, ইহাকে আধুনিক মনোবিকলনের ভাষায় বলা যাইতে পারে একটা 'উদ্‌গতি' বা 'সাব্লিমেশন' (Sublimation)। আলঙ্কারিকগণের মতে রসের সার-বস্তু হইল 'চমৎকার'। এই চমৎকৃতির তাৎপর্য হইল চিত্তবিস্তার। অর্থাৎ আমাদের রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি ভাবকে যখন একটা চিত্ত-বিস্তৃতির ভিতর দিয়া আমরা নিবিড় এবং বিরাট্ করিয়া অনুভব করি তখনই তাহা আমাদের চিত্তে একটা আনন্দের উদ্বোধ করিয়া রসতা প্রাপ্ত হয়। আলঙ্কারিকেরা আরও বলিয়াছেন যে, এই চিত্ত-বিস্তৃতিরূপ চমৎকারিত্বের মূল কথা হইল একটা পরম বিস্ময়বোধ। রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি যখন একটা গভীর বিস্ময়বোধের সহিত যুক্ত হইয়া স্বাদমানতা প্রাপ্ত হয় তখনই তাহা লৌকিকত্ব বর্জন করিয়া অলৌকিক রস হইয়া ওঠে। এই জন্য একজন আলঙ্কারিক বলিয়াছেন, আসলে বিস্ময়কে অবলম্বন করিয়া যে অদ্ভুতরস ইহাই রস—ইহাই সকল রসের মূলীভূত রস।

আলঙ্কারিকগণের এই 'বিস্ময়' কথাটির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের 'সাব্লাইম্' কথাটা অনেকখানি সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা বোধ হয় অনুচিত হইবে না। সেই দিক্ হইতে চিন্তা করিলে, বিস্ময়ের দ্বারা চিত্ত-বিস্তাররূপ চমৎকৃতিকে আমরা মনোবিকলনের

ভাষায় ভাবের উদ্‌গতি বা সাব্লিমেশন্‌ বলিতে পারি। কবিবল্লভের নামাঙ্কিত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদ—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥—

একটি মধুর রসের সার্থক পদ। আলোচনার জটিলতা এড়াইবার জন্য আগে ইহার পিছন হইতে ধর্মের পটভূমিটি সরাইয়া লইতেছি। নিছক সাহিত্য-রস হিসাবে বিচার করিতে গেলেও দেখিতে পাই, মধুর রস এখানে অপূর্ব হইয়া দেখা দিয়াছে। রস হিসাবে ইহার সার্থকতা চিত্ত-বিস্তাররূপ চমৎকৃতিতে। মনোবিকলনের ভাষায় সমস্ত জিনিসটির মূলে মানুষের চিত্ত-নিমজ্জিত একটি যৌন-বাসনা স্বীকার করিয়া লইলেও দেখি, যে-রূপে জিনিসটিকে এখানে এই কবিতার ভিতরে পাইতেছি তাহাতে চিত্তে কোন সীমায়িত সম্ভোগ-লালসার সঙ্কোচন নাই, আছে প্রেমের পরম বিস্ময়। সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা ইহার মূলে থাকিলেও বিস্ময়ানন্দে ইহার ফল-পরিণতি। প্রেমকে অবলম্বন করিয়া এখানে অনেকখানি ধ্যান আসিয়াছে—কৌতূহল আসিয়াছে—জীবন-জিজ্ঞাসা আসিয়াছে—আসিয়াছে জীবনের নিঃসীম রহস্যবোধ। এই সকলকে অবলম্বন করিয়া এখানে বিস্ময়ানন্দের যতখানি প্রাধান্যপ্রাপ্তি, ভাবের ততখানি রসতাপ্রাপ্তি।

ইহাই চিত্তপ্রবাহিত সুরতধারার ক্রমোদ্‌গতি বা সাব্লিমেশন্। এই পর্যন্ত গেল সাহিত্যের তরফ হইতে বিচার। এইবারে ইহার সহিত যদি ধর্মের পটভূমিটি যুক্ত করা যায়, তবে দেখিতে পাই, মানুষ তাহার চিত্তের সুরতধারার ক্রমোদ্‌গতিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখে নাই,—প্রেমকে অবলম্বন করিয়া চিত্তের আরও প্রসার চাই—চাই আরও উদ্‌গতি—তাই বিস্ময়ানন্দের সহিত আসিয়া যুক্ত হইল রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলার আনন্দ।

আমাদের যত সাহিত্য বা অন্যবিধ শিল্পকলা, তাহার সম্পূর্ণ না হইলেও প্রধান অংশ জুড়িয়া আছে মানুষের জীবন; আর এই মানুষের জীবন লইয়া সাহিত্যে এবং অন্যান্য শিল্পে যে রস-সৃষ্টি হইতেছে, নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে তাহার ভিতরে 'আদ্য এব পরো রসঃ'। সুতরাং মনোবিকলনের দিক্ হইতে জিনিসটিকে ভাল করিয়া বুঝিতে আমরা আদিরসকেই মুখ্যতঃ অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিতেছি।

মনোবিকলনের দিক্ হইতে সাহিত্যের মধুর রসকে আমরা এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারি। আমাদের সামাজিক জীবনে আমরা হয়ত একটি নারীর রূপে মুগ্ধ হইতে পারি এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া একটা স্থূল ভোগ-লালসা আমাদের চিত্তে জাগ্রত হইতে পারে (রূপমুগ্ধতাকেও মনোবিকলনবাদীরা হয়ত যৌন ভোগবাসনারই একটা সূক্ষ্ম রূপান্তর বলিবেন)। কিন্তু একটি সামাজিক জীব হিসাবে আমার ব্যক্তিগত রুচি-প্রবণতা, শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি চিত্তের এই স্থূল বৃত্তিটিকে এমনই স্থূল ভাবে গ্রহণ করিতে বাধা দিবে। অথচ এই নারীটি এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে ভোগাকাঙ্ক্ষা তাহা অতি সহজেই পরিহার্য নয়; তখন

মন তাহাকে চেতনলোক হইতে অবচেতন বা অচেতনলোকে সরাইয়া লইবে। সেখানে সে মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি বা ধ্যান-কল্পনার প্রভাবে ধীরে ধীরে প্রতীকধর্মী সূক্ষ্মত্ব এবং সুকুমারত্ব লাভ করে। এই সূক্ষ্ম সুকুমার রূপান্তরের ভিতর দিয়া সে যখন আবার আত্মপ্রকাশ করে তখন দেখা যায়, যাহা ছিল একটি সঙ্কীর্ণ পরিবেশের ভিতরে একজন ব্যক্তির তাহা হইয়াছে একটি বৃহৎ পরিধির ভিতরে সর্বজনের। এইরূপে ইহা যেমন এক দিকে একটা বৃহত্তর পরিধির ভিতরে ব্যাপকত্বের মহিমা লাভ করে, তেমনই অন্য দিকে ইহা আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিলব্ধ নানাপ্রকার শ্রেয়োবোধের সহিত যুক্ত হইয়া গৌরবোজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। একটা ভোগ-বাসনাকে যখন শুধু আমার একটি ব্যক্তিকেন্দ্রে সীমায়িত করিয়া দেখি এবং আমার সঙ্কীর্ণ সামাজিক পরিবেশের ভিতরে তাহাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া পাই, তখন স্বাভাবিক ভাবেই আসে ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ,—হয়ত আসে অতৃপ্তি; তাহাকে যখন মনুষ্য-সাধারণের ভিতরে প্রায় নিঃসীম করিয়া পাইলাম, তখন তাহাকে গ্রহণ করিতে এই সকল বাধাই দূরীভূত হইয়া যায়। সঙ্কোচের ভিতরেই আসে মানুষের চিত্ত-সঙ্কোচন,—অসঙ্কোচের ভিতরেই অবাধিত চিত্ত-প্রসার। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে রাজা দুষ্মন্তের যে রূপমুগ্ধতা এবং প্রেমের আকূতি দেখিতে পাই, তাহা মানুষের কোন শ্রেয়োবোধের সহিত যুক্ত হইয়া কোন মহিমান্বিত রূপ লাভ করে নাই; এ কথাও সত্য নহে যে, নাটকের শেষ অংশে নাট্যকার বিরহের তপশ্চর্যাপূত যে মহিমান্বিত প্রেমের পরিণতি দেখাইয়াছেন শুধু তাহারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়াই এই রূপমুগ্ধতা বা কামনা-বাসনা শিল্প-সামগ্রীত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে। এখানকার রূপমুগ্ধতার

ভিতরেও যে একটা ভোগ-লালসা অনুস্যূত রহিয়াছে কোন কাব্য-রসিক তাহাকে অস্বীকার করিবেন না, বরঞ্চ কেহ কেহ বলিবেন, এই 'প্যাশন্'ই নাটকখানির প্রথম দিক্‌টি প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই শিল্পাধিকারের কারণ কি? কারণ, এখানকার যৌবনের যৌন-লালসা কোনও ক্ষুদ্র সমাজ ও ব্যক্তির পারিপার্শ্বিকতার গণ্ডির ভিতরে সঙ্কুচিত হইয়া দেখা দেয় নাই, ইহাকে এখানে নিখিল যৌবনের অন্তর্নিহিত একটি অনস্বীকার্য চিরন্তন সত্য বলিয়া লাভ করিয়াছি। শুধু নিখিল মানবের যৌবনের সত্য নয়, কবি নিপুণ বর্ণনা-কৌশলে ইহাকে যতটা পারেন বিশ্ব-জীবনের সত্য করিয়া আরও ব্যাপকতা দান করিয়াছেন। এ জিনিসটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে এবং কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে। মেঘদূত-এর ভিতরে শুধু প্রেম নয়, স্থূল সম্ভোগের দৃশ্য বা আভাসও নেহাৎ অপ্রচুর নয়; কিন্তু এই রতি-রভসকে কবি নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, আকাশ-মেঘ, তরু-লতা, পশু-পাখী সকলের ভিতরে এমন ওতঃপ্রোতভাবে মিশাইয়া দিয়াছেন যে, তাহা বিশ্বজীবনেরই একটি আনন্দময় সত্যের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চিত্তের এই বাধাহীন গ্রহণের ভিতরেই আনন্দের নবত্ব, চারুত্ব এবং শ্রেয়স্ত্ব রহিয়াছে, এইখানেই শিল্প-রসের উদ্বোধ। উল্লিখিত প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, কালিদাস আবার এই বস্তু-বিস্তৃতির সহিত তাঁহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কল্পনাজালের কারুকার্যের অসংখ্য মণ্ডন-কলা যোগ করিয়া দিয়াছেন; তাহা পূর্ব-বিস্তৃতি ও শ্রেয়স্ত্বকে আরও চারুত্ব দান করিয়াছে। এই ভাবেই ঘটিয়া থাকে আমাদের স্থূল বৃত্তিগুলির রূপান্তর।

ভাবের এই সাব্লিমেশন্ বা উদ্‌গতির প্রসঙ্গে কাব্য-রস সম্বন্ধে

এ্যারিস্টট্লের মতটিও এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই কাব্য-রসের একটি বিশেষ অর্থক্রিয়াকারিত্ব রহিয়াছে, এ্যারিস্টট্ল্ তাহার নাম দিয়াছেন 'ক্যাথার্সিস্'। ইহা একপ্রকারের চিত্ত-বিরেচন। এ্যারিস্টট্ল্ ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গেই কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চিত্তের ভিতরে দুইটি সর্বাপেক্ষা বিক্ষোভকারী বস্তু হইল 'করুণা' এবং 'ভয়'। 'করুণা' বলিতে তিনি মনে করিয়াছেন, কোনও একটা অহেতুক দুর্দশা—একটা অবাঞ্ছিত দুরদৃষ্টের দ্বারা সৃষ্ট মনের অবস্থা; 'ভয়' বলিতে তিনি মনে করিয়াছেন, জীবনের ক্ষেত্রে মানুষ একান্ত অসহায়ভাবে ক্লিষ্ট হইলে মনের যে অবস্থা হয় তাহাই। আমাদের বাস্তব জীবনের এই করুণা ও ভয় আমাদের জীবনকে নিরন্তর পীড়িত করিতেছে। ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে আমরা অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য আমাদের চিত্তের এই করুণা ও ভয়-বেদনাকে ব্যক্তিকেন্দ্রের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-মানবতার বিরাট্ পরিধিতে অনুভব করিতে পারি। বিশ্বজনীনতা এবং সর্বকালিকতার স্পর্শে এই ব্যক্তিকেন্দ্রে প্রতিরুদ্ধ বেদনার বিষক্রিয়ার অনেকখানি উপশম ঘটে; ট্র্যাজেডিও তাই আমাদের নিকট আনন্দদায়ক। এ্যারিস্টট্লের এই মতটিকে আর একটু ব্যাপক করিয়া সাহিত্যের সকল রস সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমাদের ব্যক্তিগত রতিস্পৃহা শোক, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রে ধূমায়িত হইয়া নিরন্তর লৌকিক জীবনে চিত্তক্ষোভের আলোড়ন উপস্থিত করিতেছে। ব্যক্তি-দুর্গের স্বল্প পরিসরের ভিতরে সে কেবলই বাধা পাইয়া নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হইতেছে, এই দুর্গের প্রাচীর ভাঙিয়া তাহাদিগকে একটা

গৌরবোজ্জ্বল ব্যাপ্তির ভিতরে মুক্তি দিতে পারিলেই আমাদের আনন্দ। মনোবিকলনবাদিগণেরও এই কথায় পরিপূর্ণ সায় রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন, সমাজ-বিধি, আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা-নীতি প্রভৃতি আমাদের চারি পাশে অতন্দ্রিতভাবে বেত্রদণ্ড-হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; লৌকিক ভাবের প্রবাহগুলি চারি দিকেই তাই কেবল বাধা পায়; বাধা পাইয়া তাহারা আমাদের চিত্তের ভিতরে বিক্ষোভের আবর্ত সৃষ্টি করিয়া মনের গহনে চলিয়া যায়; সেখানে যদি আমরা তাহাদিগকে কেবলই নিগৃহীত এবং নির্যাতিত করিয়া রাখিতে চাই তবে তাহারা মনের তলদেশটি বিষাক্ত করিয়া দিতে থাকে। সাহিত্য এবং শিল্পের ভিতর দিয়া যদি তাহাদের উদ্‌গতি হয় তবে তাহারা মনের চেতনদেশে আবার অবাধে এবং স্বচ্ছন্দে ভাসিয়া বেড়াইবার অধিকার লাভ করে। লৌকিক ভাব-প্রবাহ যখন ব্যক্তি-কেন্দ্রের কন্দরকে ছাপাইয়া উঠিয়া কল্পনার সীমাহীন শ্যামল ক্ষেত্রে বঙ্কিমরেখায় এবং বিচিত্র কলধ্বনিতে বিহার করিতে থাকে তখন তাহার যে ব্যাপ্তি ও মহিমা তাহাই আমাদের কাব্যানন্দ বা শিল্পানন্দ। ভাব-প্রবাহের এই উদ্‌গতি শুধু আমাদের আনন্দ দান করে না, আমাদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য-বিধানও করে। ক্যাথার্‌সিস্ কথাটার সহিত এইখানেই মনোবিকলনবাদিগণের মতের গভীর মিল পাইতেছি।

এইখানেই একটু অবহিত হইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আমাদের শিল্প-রসের ভিতরে যে একটা উদ্‌গতি বা সাব্‌লিমেশন্ রহিয়াছে, সেই সিদ্ধান্তে আপত্তি করিবার বেশী কিছু না থাকিলেও, এই উদ্‌গতির প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিষয়টি বিশেষ অবধানযোগ্য এই কারণে যে, এই উদ্‌গতির

প্রকৃতির উপরেই অনেকখানি নির্ভর করিবে সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রকৃতি।

প্রশ্ন এই, আমাদের এই মানসিক উদ্‌গতি কেন ঘটে? ইহা কি মূলতঃ চিত্ত-বৃত্তির নিগ্রহ এবং নির্যাতন-প্রসূত, না ইহাই মানুষের 'সহজ' ধর্ম? মনোবিকলনবাদিগণ বিশেষ করিয়া ফ্রয়েড্-পন্থিগণ এই নিগ্রহ-নির্যাতনের উপরেই অনেক সময় বড় বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। ফলে দাঁড়ায় এই, আমাদের শিল্প-সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের মূলে প্রধান শক্তিরূপে (libido) দেখা দেয় এই চিত্ত-নিগ্রহ। যাহাকে বাস্তব সমাজ-জীবনে স্থূলে ভোগ করিতে পারি না, তাহাকে কল্পনার আড়ালে সূক্ষ্মরূপে উপভোগ করি। বাস্তব জীবনের বিবিধ পরিচ্ছেদ এবং তজ্জনিত বাধাই যেন চিত্তকে এই নিরঙ্কুশ স্বচ্ছন্দ-বিহারের প্রেরণা যোগায়। ফলে বিবিধ রূপান্তরের ভিতর দিয়া যাহা পাই তাহা স্থূল বৃত্তিগুলির সূক্ষ্ম মনোময় আস্বাদন। শুধু তাহাই নয়, ইহার ভিতরে যেন একটা ছদ্মবেশ এবং ভাণের উপাদানও রহিয়াছে। তা ছাড়া, মনোবিকলন শাস্ত্র আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলির ভিতরে যৌন-বৃত্তিকেই আদিমতম এবং প্রধানতম বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে; ফলতঃ, এই জাতীয় একটি বিশ্বাস এবং মতবাদ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের সকল সৌন্দর্যবোধ এবং সূক্ষ্ম সুকুমার শিল্প-কলার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, মূলতঃ যৌন-বৃত্তি হইতেই তাহারা বিবিধ-বিচিত্র উপায়ে তাহাদের উপজীব্য রস সংগ্রহ করিয়াছে। একজন উৎসাহী মনোবিকলনবাদীর একখানি গ্রন্থ পড়িয়াছি; তিনি ফরাসী-সাহিত্যের ভাল ভাল কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়া নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ঐ সকল কবিতা কবিগণের নিগৃহীত

যৌন-বাসনারই ছদ্ম রূপান্তর এবং চাতুর্যপূর্ণ প্রকাশ—দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ভোগ সম্ভব হয় নাই, মনের ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহারই নিরঙ্কুশ সম্ভোগ।

ক্ষুধা এবং যৌন-বাসনাই যে মানুষের আদিমতম, এবং একদিক্ হইতে প্রধানতম, বৃত্তি এ-কথা কোন দেশেই অস্বীকৃত নয়। সাহিত্য এবং সাধারণ শিল্পের ইতিহাস বিচার করিলে সর্বত্র না হইলেও, অনেকাংশে আমাদের শিল্প-সৌন্দর্যবোধ যে আমাদের যৌন-বোধের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিলিয়া আছে, এ-কথাকেও আমরা চট্ করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার তত্ত্ব যতই গহন-গম্ভীর হোক্, বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির কবিতাগুলি, চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগ, গোবিন্দদাসের অভিসারের পদগুলি সাহিত্য হিসাবে আস্বাদ করিবার সময় আমাদের যে চিত্ত-চমৎকৃতি তাহার ভিতরে আমাদের যৌন-বৃত্তির কোন সূক্ষ্ম-সংমিশ্রণ নাই এ-কথা বলিতে পারি না। আবার রবীন্দ্রনাথ যেমন বৈষ্ণব কবিগণের প্রতি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম-গান
বিরহ-তাপিত? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্ত রাতে মিলন-শয়ানে
কে তোমারে বেঁধেছিল দু'টি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে

রেখেছিল মগ্ন করি। এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে।—

ঠিক তেমনই আবার রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার 'মানসস্থন্দরী'কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানসস্থন্দরী,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও—মৃণাল পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধতনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্তপ্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।—

তখনকার এই মানস-স্থন্দরীই বা এতখানি ইন্দ্রিয়-আকর্ষণ কোথা হইতে লাভ করিল? রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-জীবনের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় এক 'অপরিচিতা' 'মধুর-হাসিনী' 'বিদেশিনী'র সহিত একাকী এক নায়ে যাত্রা করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের জীবনে যখন 'পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ' বাজিতেছিল তখনও রবীন্দ্রনাথের চির-চঞ্চলা, লীলা-সঙ্গিনী

'ডাকিলে আবার কবেকার চেনা স্থরে,
বাজাইলে কিঙ্কিণী।'

এবং 'এলোচুলে ব'হে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল।'

রবীন্দ্রনাথের এক 'চিত্রা' কাব্যের ভিতরেই দেখিতে পাই, কবি অন্তর-বাহির জুড়িয়া যাঁহার বিচিত্র লীলা দর্শন করিয়াছেন সেই বিচিত্ররূপিণী চঞ্চল-গামিনী চিত্রারই যে শুধু—

মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।—

তাহা নহে, তাঁহার 'অন্তর্যামী'ও চির-কৌতুকময়ী ; 'দিনশেষে' যখন ধরণী আঁধার হইয়া আসিয়াছে তখন—

"হ্যাঁ গো এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে,"
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি
ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী।
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।

'সিন্ধু পারে' যে কবির 'পউষ প্রখর শীতে জর্জর ঝিল্লিমুখর রাতি'তে অভিসার সেখানেও

দেখিনু দুয়ারে রমণীমূরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।

এবং তখন,—

নীরব রমণী অঙ্গুলি তুলি দিল ইঙ্গিত করি—
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতন সম চড়িনু অশ্ব 'পরি।

আমাদের সকল শিল্পের আনন্দই যে অপ্রয়োজনের আনন্দ, শিল্পসৃষ্টি

যে একান্ত বাস্তব কেজো জগৎটির পক্ষে একান্ত 'অনাবশ্যক' এই কথাটি প্রকাশ করিতেও 'আবশ্যক' হইয়াছে 'কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে' একটি 'বালিকা'—যে তাহার আঁচল-আড়ে প্রদীপখানি ঢাকিয়া একলা পথে ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তাহার নিকটে যখন তাহার দীপটি একটি অন্ধকার ঘরে রাখিবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছিল, তখন—

গোধূলিতে দু'টি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল "ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।"

শিল্প এখানে এই গোধূলির পটভূমিতে কালো নয়নদুইটি হইতে কতখানি রহস্য লাভ করিয়াছে বলা শক্ত। এ-জাতীয় দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। 'গীতে'র দ্বারা যেখানে কবি তাঁহার পরমারাধ্যের পদে অঞ্জলি দিয়াছেন সেখানেও দেখি—

সে যে পাশে এসে ব'সেছিলো
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিলো
হতভাগিনী।
এসেছিলো নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেলো
গভীর রাগিণী।

তখন কবির বক্তব্য যাহাই থাক্, রসানুভূতি যাহা লাভ হয়, তাহার

মিশ্রত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যের 'ভাবীকাল' কবিতায় যখন দেখিতে পাই—

ক্ষমা কোরো যদি গর্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি—মোর কাব্যখানি লয়ে করে
দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী,
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।
আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা ;
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে ;
হয়তো ভাবিছ, "যদি থাকিত সে বেঁচে
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।"
হয়তো বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।"—

তখন বেশ বোঝা যায়, ভাবীকালে যে কবির অমর হইয়া থাকিবার ইচ্ছা তাহা শুধু বিশুদ্ধ শিল্পিরূপে নয়, এখানে শিল্পীর অমরত্বের সহিত নারীপ্রেমের মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

কিন্তু সাধারণ ভাবে আমাদের শিল্প-রসানুভূতির সহিত আমাদের যৌন-রসানুভূতি মিশ্রিত হইয়া থাকে এ-কথা স্বীকার করিলেই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় না যে, আমাদের শিল্প-বোধ প্রতিহত এবং রুদ্ধ যৌন-বাসনা হইতেই উৎসারিত। মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে কেবল নিগৃহীত বাসনাই যে ছদ্মবেশ ধারণ করিবার জন্য উদ্গতি লাভ করে এ-কথা সত্য নহে, সত্য হইলে তাহা

মনুষ্যত্বেরই প্রকাণ্ড অপমান হইত। চিত্তের ক্রমোদ্‌গতির ভিতরেই নিহিত মানুষের সকল মহত্ত্ব; তাহা যদি মানুষের সহজ ধর্ম না হইত, তাহা হইলে 'মহত্ত্ব' জিনিসটাই মানুষের জীবনে সহজ ধর্ম হইতে পারিত না, সর্বত্রই সে কতকগুলি বিশেষ হেতু-প্রত্যয়ের চাপে একটা আরোপিত ধর্ম হইত। পশুসাম্যে সকল পশুবৃত্তিই মানুষের ভিতরেও স্থান পাইয়াছে; কিন্তু সেই পশুধর্মের সহিত তাহার ভিতরে একটি মহত্তার বীজ উপ্ত রহিয়াছে, সেই মহত্তাই তাহার পশুধর্মকে নিরন্তর শুধু রূপান্তরিত নয়—ধর্মান্তরিত করিয়া তাহাকে মহান্ করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রথম দিন হইতে নর-নারী উভয়েই উভয়কে অবলম্বন করিয়া তাহাদের চিত্তের যে আকর্ষণ তাহাকে বিচিত্র উপায়ে রূপান্তরিত এবং ধর্মান্তরিত করিয়া লইয়াছে; এবং তাহা যে তাহারা করিতে পারিয়াছে তাহার কারণ কেবল কতগুলি চিত্তবৃত্তির নিগ্রহই নয়, তাহার কারণ নর-নারীর সহজাত মহত্ত্ব ধর্মও। নারী যে আমাদের নিকটে দেবী হইয়া উঠিয়াছে, সর্বত্র তাহা বাস্তব বাধা-বিপত্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ছলনা মাত্র নয়; ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আমাদের অন্তর্নিহিত মহত্তার তাগিদও—আমাদের সহজধর্মের স্ফুরণ। এই যে মহত্ত্বের বীজ তাহা আমাদের দেহ-মনের ভিতরে থাকিয়া আনিতে চায় আমাদের অনুভূতির প্রসার—আনিতে চায় পবিত্রতার জ্যোতি, আনিতে চায় অনন্তের মহিমা। এই সহজ ধর্মের তাগিদে সকল লৌকিকই অলৌকিক বা লোকোত্তর হইয়া যায়। কালিদাস যেখানে উদ্ভিন্ন-যৌবনা উমার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন,—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥—

সেখানে শুধু মানুষের সভ্যসমাজে ঢাকিয়া-চাপিয়া কথা বলিবার জন্যই উমার স্তনভারকে পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকের সহিত উপমিত করিয়া উমাকে সঞ্চারিণী লতা করিয়াছেন, এ কথা স্বীকার করিব না। যৌবন-ভারে আনম্রা একটি নবযুবতীর রূপ-মহিমাকে কবি এখানে যতটা পারেন বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-মহিমার সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে প্রসারিত ও মহিমান্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ, অল্পে যে মানুষের তৃপ্তি নাই—তাহার অণু-পরমাণুর মধ্যে যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে অন্তরের অনুপ্রেরণা। একটি নারীর ছোট দুইটি চোখ—ছোট একখানি বুককে তাই মানুষের কবি-মনকে অনেকখানি বড় করিয়া লইতে হইয়াছে। তাই—

সীমাহীন নীলাকাশ আসিয়াছে নামিয়া
মর্তের ক্ষুদ্র ও বক্ষে।
বাধাহীন জলভরা মেঘ আছে থামিয়া
কজ্জলকালো দু'টি চক্ষে।

মানুষ যে এখানে যৌন-বাসনাকেও সীমাহীন নীলাকাশের সহিত তাহার স্বচ্ছন্দবিহারী জলভরা মেঘগুলির সহিত পরিব্যাপ্ত করিয়া লইয়াছে তাহাই বলিয়া দিতেছে—মানুষ বড়; সে নিরন্তর আরও বড় হইতে চায়; সে তাহার স্থূলকে সূক্ষ্ম করিতে চায়, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিতে চায়,—সকল ক্লিন্নতাকে ধ্যান-কল্পনার পাবক-স্পর্শে অনন্ত জ্যোতির্ময় করিয়া পাইতে চায়। ইহার ভিতরে তাই শুধু সুনিপুণ 'ভাণে'র চাতুর্য নাই—উদ্‌গতি বা ঊর্ধ্বগতির মহিমাও আছে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বর্ণনা দিলেন—

আঁচলখানি প'ড়েছে খসি' পাশে
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি ;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দু'টি।—

তখন এই 'পূজার ফুল দু'টি'কে কি শুধুই ছদ্মবেশের প্রতারণা বলিয়া কবি-চিত্তের সহজধর্মের অবমাননা করিব? ভোগের সামগ্রীকেও যতটা পারি বড় করিয়া এবং পবিত্র করিয়া গ্রহণ করিবার যে আন্তরিক প্রেরণা তাহাই এই শিল্পরূপকে এবং শিল্পানুভূতিকে লোকোত্তরত্ব দান করে।

আমাদের প্রথম কথা হইল, আমাদের চিত্তবৃত্তির উদ্‌গতিরূপ যে রূপান্তর তাহা কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা নিগ্রহ-জনিত নয়, ইহার ভিতরে আমাদের মহৎ মনুষ্যধর্মের সহজ প্রকাশ রহিয়াছে। দ্বিতীয় কথা এই—উদ্‌গতির ভিতর দিয়া চিত্তবৃত্তির এই যে রূপান্তর তাহা রূপান্তর মাত্র নহে, তাহা ধর্মান্তরও বটে। এই কথাটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। লৌকিক একটি ভাব বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন উদ্‌গতির ভিতর দিয়া যখন আমাদের চিত্তে রসতা-প্রাপ্ত হয় তখন সে লৌকিক ভাব হইতে একটি পৃথক্ ধর্ম—সুতরাং পৃথক্ মূল্য লাভ করে। লৌকিক ভাব হইতে রসতা-প্রাপ্তি পর্যন্ত চিত্তের একটি পরিবর্তনশীল প্রবাহ আছে, এই প্রবাহের ভিতর দিয়াই ঘটে বস্তুর ধর্মান্তর। বিবর্তনবাদী কোন কোন দার্শনিক বলেন, নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়া একটি নিরন্তর বিবর্তন-প্রবাহ চলিয়াছে ; বিবর্তনের প্রবাহের ভিতরে বস্তু সর্বদাই আপন ধর্ম বদলাইয়া নবতর ধর্ম গ্রহণ করে ; প্রবাহের ভিতর দিয়া প্রতি মুহূর্তে তাহার মধ্যে একটি নবতম সত্তার আবির্ভাব ঘটিতেছে। বহির্লোক

সম্বন্ধে যে কথা সত্য, আমাদের চিত্তলোকের সম্বন্ধেও সেই কথাই সত্য। আমাদের যে অনুভূতি শুধু বর্তমানের ক্ষণিক ভাসমানতার ভিতরেই নিবদ্ধ নয়, যাহার পশ্চাতে যত বেশী দিনের বিচিত্র পরিবর্তনের অর্থাৎ প্রবাহের ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার ভিতরেই তত বেশী ধর্মান্তর ঘটিয়াছে। একটি বহু পুরাতন দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াই কথাটিকে বোঝা যাক্। পঙ্ক হইতেই বিকশিত শতদলের অবির্ভাব। পঙ্কধর্ম হইতে উপজীব্য সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রাণ-প্রবাহের প্রথম যাত্রা; কিন্তু বহুদিনের কাদা-জল ঘাঁটিয়া একদিন যখন সে ইহাদের সকলের উপরে মাথা তুলিয়া পূর্ণবিকাশ লাভ করিল, তখন রেখায় বর্ণে গন্ধে সুষমায় সে পঙ্কধর্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বরূপ-বিলক্ষণ। এই 'স্বরূপ-বিলক্ষণ'তার কারণ কি? কারণ, পঙ্কধর্মের ভিতরে একস্থানে একটি 'বীজ' আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই বীজের ভিতরে ছিল একটা নিরন্তর প্রকাশের ধর্ম—একটা প্রাণের 'প্রৈতি'; এই প্রাণের 'প্রৈতি'ই তাহার সকল উদ্‌গতির মূলে। এই প্রাণ-প্রৈতির ভিতরেই ছিল অনেক মহদ্ধর্মের প্রেরণা—ছিল সকল ক্লিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া উন্মুক্ত আকাশতলে আত্মপ্রকাশের আবেগ, ছিল সমীরণের স্বপ্ন, সূর্যের ধ্যান; সেই ধ্যান-স্বপ্ন-পূত ক্রমোদ্‌গতির প্রবাহই তাহাকে নূতন ধর্ম, নূতন মহিমা দান করিয়াছে।

মনুষ্যধর্মকে যদিও তাহার জন্তু-জীবনের ক্লেদ-ক্লিন্নতার মাঝখান হইতেই উপজীব্য সংগ্রহ করিতে হয়, তথাপি তাহার মধ্যেও অনন্ত উদ্‌গতির সম্ভাবনাময় এইরূপ একটি মহত্ত্বের বীজ রহিয়াছে; সেই বীজেরই সহজ প্রকাশ তাহার সকল মহিমার মধ্যে।

এই ক্রমোদ্‌গতির ভিতর দিয়া ক্রমধর্মান্তর লাভের সত্যটাই একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল ভারতবর্ষের সকল তন্ত্র-সাধনা

এবং পরবর্তী সহজ-সাধনার ভিতরে। ইহা সর্বাপেক্ষা বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বৈষ্ণব সহজিয়াগণের প্রেম-সাধনার ভিতরে। এ-সাধনার আরম্ভ কামে, পরিণতি পরিপূর্ণ প্রেমে। তাঁহারা বলেন, কাম হইতেই প্রেমের উৎপত্তি, কিন্তু তাঁহারাও মানিতেন,

কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ-বিলক্ষণ॥

* * *

অতএব কাম-প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্মল ভাস্কর॥

কামকে অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হয় তাঁহাদের সকল দৈহিক তপশ্চর্যা এবং মানসিক ধ্যান-সাধনা। এই সাধনার অগ্নির পুটপাকে জারিত হইয়া একটি বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কামের লৌহই একদিন প্রেমের 'নিকষিত হেম'রূপে দেখা দেয়। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ এই প্রেম-সাধনার নাম দিয়াছেন 'আরোপ'-সাধনা। এই আরোপ-সাধনার মূল কথা, নারীতে রাধা-ভাবনা এবং পুরুষে কৃষ্ণ-ভাবনা। তাঁহাদের মতে, এই ভাবনা বা ধ্যানের দ্বারা নারী রাধাই হইয়া যায়, পুরুষ কৃষ্ণই হইয়া যায়; তখন তাঁহাদের যে মিলন ইহা নিত্য-লীলার আস্বাদন। এখানকার উদ্‌গতির বড় কথাই হইতেছে 'ক্ষণে'র দেশ হইতে 'কালে'র দেশে বা 'নিত্যে'র দেশে বিচরণ। এই 'নিত্য'ই সহজিয়াদের সর্বাপেক্ষা বড় সহায়, তাই 'নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিলা সহজ জানাবার তরে'। ধ্যান বা ভাবনার ফলে লৌকিক 'ক্ষণের দেশের' যখন 'নিত্যে'র স্পর্শলাভ ঘটিল, তখনই সে 'সহজের দেশে' রূপান্তরিত এবং ধর্মান্তরিত হইয়া গেল। এই 'নিত্যের দেশ'ই সহজিয়াগণের 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবন'। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে

এবং প্রাকৃত বৃন্দাবনে 'অনেক অন্তর'; কিন্তু ইহাদের ভিতরে আবার একটা 'মিশামিশি'ও রহিয়াছে।

সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর
জানয়ে সকল লোকে।
সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে
এ কথা কোয়ো না কাকে॥

এই যে 'সে দেশ' এবং 'এ দেশে' একটি 'মিশামিশি', একের অপরের রূপে রূপান্তর এবং ধর্মান্তর বা অপরের একের ভিতরে আবির্ভাব—ইহাই বৈষ্ণব-সাধনার গূঢ়তম এবং গুহ্যতম তত্ত্ব, এই জন্যই এ-কথা কাহাকেও বলিতে মানা।

সহজিয়া বৈষ্ণবগণ 'লীলাক্ষেত্র' বৃন্দাবনের তিনটি স্বরূপ-বিভাগ করিয়াছেন—বন-বৃন্দাবন, মনো-বৃন্দাবন এবং নিত্য-বৃন্দাবন। শিল্পরসের আলোচনাতেও এই তিনটি বিভাগ মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমাদের জীবন-নটরাজের লীলাক্ষেত্র এই বিশ্ব-বৃন্দাবনেরও তিনটি রূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। একান্ত লৌকিক প্রাকৃত জগৎটি জীবন-নটরাজের বন-বৃন্দাবন; আর যেখানে পূর্ণভাবে 'নিত্যে' প্রতিষ্ঠা, সেখানে চিত্তের সম্পূর্ণ উপাধি-মুক্তি, ইহাই আমাদের অধ্যাত্ম-রাজ্য; আর মাঝখানে আছে যে মনো-বৃন্দাবন তাহার সহিত এক দিকে 'বনে'র যোগ রহিয়াছে, অন্য দিকে 'নিত্যে'র যোগ রহিয়াছে; এই দুই দিক হইতে 'বন' ও 'নিত্যে'র স্পর্শ লাগিয়া মাঝখানে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে আমাদের রসের বৃন্দাবনটি। সকল শিল্পকলার উৎসারণ এখান হইতে। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণের ধাম-তত্ত্বের কথাও স্মরণ করা যাইতে পারে। ধামের কোন্ তত্ত্বে চিত্ত অবস্থান করিতেছে তাহার উপরেই নির্ভর করে চিত্তের গ্রহণ-

ধর্মের সকল পার্থক্য। শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন এই ধাম-তত্ত্বের। কোনও বিষয়ের শিল্পযোগ্যত্ব কোথায় কতখানি, তাহা নির্ভর করিবে এই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চিত্ত কোন্ ধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারই উপরে।

শিল্পরসকে মনো-বৃন্দাবনের বস্তু বলিবার ভিতরে একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমরা পূর্বে চিত্তের উদ্‌গতি সম্বন্ধে যত কথা আলোচনা করিয়াছি, তাহা বিশ্লেষণ করিলে একটি কথা খুব প্রধান হইয়া দেখা দিবে; তাহা এই যে, আমাদের চিত্তের যত প্রকারের উদ্‌গতি বা 'সাব্লিমেশন্' তাহার ভিতরে একটি ধ্যান-প্রক্রিয়া অনুস্যূত রহিয়াছে। আমরা পূর্বে চিত্ত-বৃত্তির উদ্‌গতি-প্রসঙ্গে অগ্নির পুটপাকে জারিত হইবার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছি বা একটি ক্রম-পরিস্রুতির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছি। এইগুলি নিছক আলঙ্কারিক বর্ণনা নয়, অনেকখানি বাস্তব বর্ণনা। ভাবের সহিত ভাবনা যুক্ত না হইলে তাহা জারিত বা পরিস্রুত হইয়া উদ্‌গতি লাভ করে না। লৌকিক ভাব আমাদিগকে বিমূঢ় করে; তাহা যখন লোকোত্তরত্ব লাভ করে তখন আমাদিগকে শুধু ভাবস্থ করে না, আমাদিগকে ভাবায়ও। এই যে গহন-গম্ভীর অনন্ত ভাবনা ইহাই পরম বিস্ময়, ইহাই ত বিশ্ব-নিখিলের পরম রহস্য, এই রহস্যবোধযুক্ত না হইলে কোন ভাবই রস হয় না। পূর্বেই দেখিয়াছি, চিত্তের সকল উদ্‌গতির মূলে আছে এই ধ্যান-বিস্ময়। জীবনে এবং শিল্পে তফাৎ এইখানে, এক জায়গায় সবই শুধু ঘটিতেছে, আর এক জায়গায় সকল 'ঘটনা'র পশ্চাতে কেবলই ভাবনার অনুরণন বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার ভিতরেই ধরা পড়িয়াছে তাহার সকল মহিমা। এইজন্য সর্ব যুগের সর্ব প্রকারের শিল্পীই স্বীকার করিয়াছেন যে, চিত্তবিক্ষোভকারী

কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতি হওয়ামাত্র তন্মুহূর্তেই কেহ কোন শিল্প সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। শিল্পসৃষ্টি হইয়াছে তখনই, যখন শিল্পীর ধ্যানসমাহিত চিত্তের ভিতরে সেই অনুভূতি এক অপরূপ প্রশান্তি এবং মহিমা লাভ করিয়াছে।

ধ্যান মানুষের পঙ্কক্লিন্ন জীবভূমির ভিতরে উপ্ত সকল মহত্ত্বার বীজ। ধ্যান আহ্বান করে অনন্তের—সে অনন্তের অসীমেরই চিত্তধৃত স্পন্দনরূপ। পঙ্কের ভিতরে যে বীজটি আসিয়া পড়ে তাহার ভিতরে যদি অনন্ত আলোর স্বপ্ন—সূর্যের ধ্যান—না থাকিত তবে সে অতখানি উদ্‌গতি লাভ করিয়া রেখায় বর্ণে গন্ধে শতদল-রূপে বিকশিত হইতে পারিত না। মানুষের চিত্ত লৌকিক জীব-ভূমিতেই শিকড় প্রসারিত করিয়া আছে; কিন্তু জীবভূমি হইতে নিরন্তর আহরিত রস-সম্ভারের ভিতরে কেবলই লাগিতেছে ধ্যান-সহযোগে অনন্তের স্পর্শ, আসিতেছে নূতন মহিমা, তাহারই পরিণতি আমাদের শিল্পরসে। এই ধ্যানের মহিমা অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি বাক্যে—

ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌ র্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাঃ। তস্মাদ্ য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি···ধ্যানমুপাস্স্বেতি।

ধ্যান চিত্ত হইতে অনেক বড়; তাই পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, অন্তরিক্ষ যেন ধ্যান করিতেছে, আকাশ যেন ধ্যান করিতেছে—সমুদ্র (জল), পর্বত, দেব, মনুষ্য সকলেই যেন ধ্যান করিতেছে। অর্থাৎ যেখানেই তাহাদের ধ্যান-রূপ সেখানেই তাহাদের মহিমা। এই জন্য মানুষের ভিতরে যাঁহারা 'মহত্ত্বা' লাভ করেন তাঁহারা এই

পৃথিবীতেই, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে থাকিয়াই 'ধ্যানাপাদাংশ' হন—ধ্যানেরই ফলের অংশী হন। অতএব 'ধ্যানের'ই উপাসনা করা উচিত। উপনিষদের এই সুরেই সুর মিলাইয়া বলা যায়—ধ্যানবলেই মানুষের সকল উদ্‌গতি—ধ্যানবলেই আমাদের সকল লৌকিক হইতে লোকোত্তরত্বে উত্তরণ।

রিয়ালিজ্‌ম্

বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ দেশে কতকগুলি জনপ্রবাদকে আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। এগুলি যে ঠিক কখন ঘটে এবং কখন রটে তাহা ধরা কঠিন; সাধারণতঃ রটনার প্রাবল্যই আমাদের দৃষ্টিকে ঘটনার সম্ভাবনার দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, এই জাতীয় জনপ্রবাদ কখনই একেবারে মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠে না, পাহাড়ের স্তূপীকৃত কালো মাটির ফাটলে ফাটলে সোনার রেখার মতন সত্যের সোনালি মিশ্রণে তাহারা বহুমূল্যত্ব লাভ করে।

আমাদের বর্তমান কালের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় কতকগুলি জনপ্রবাদ প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। ইহাদের ভিতরে প্রধান একটি হইল, সাহিত্যের আধুনিক যুগটা 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর যুগ। কথাটাকে প্রথমে কিছু দিন বিজ্ঞজনোচিত অবজ্ঞায় কোণঠাসা করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা গিয়াছে, অজ্ঞজনোচিত উপহাসও ইহা কম লাভ করে নাই; কিন্তু এসব সত্ত্বেও রটনাটা যখন দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তখন পিছনকার ঘটনার কথাও আবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইতেছে।

প্রথমেই ভাবিতে হইবে 'আধুনিক যুগ'টার কথা। আমাদের মনের ভিতরে সাধারণভাবে 'আধুনিক যুগ' সম্বন্ধে যে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে তাহা একটি সন-তারিখের চৌহদ্দিযুক্ত বিশেষ রঙে রঞ্জিত কালখণ্ড বিশেষ। আপাততঃ ইহার এক সীমানায় দাঁড়াইয়া

আছে ১৩৫৭ সাল, তর্ক অপর সীমানার বিস্তৃতি সম্বন্ধে। উগ্রবাদীরা হয়ত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথি হইতে আর পশ্চাৎপদ হইতে চাহিবেন না; কাহারও ঝোঁক হয়ত হইবে কবিগুরুর জন্মক্ষণের পুণ্যলগ্নের প্রতি; কেহ হয়ত পিছাইয়া যাইবেন মধু-বঙ্কিমের আবির্ভাবকালে; কাহারও বিস্তৃতি রাজা রামমোহনের রাজত্বে; আবার যিনি সাবধানী তিনি হয়ত বলিবেন, সন্ধানী দীপবর্তিকা লইয়া সুড়ঙ্গপথে চলিয়া যাওয়া যাক্ ভারতচন্দ্রেরই মাঙ্গলিক কাব্যে। এই সীমানা-সমিতির সুপারিশ গৃহীত হইলেই দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে—এই সীমানাটি যথার্থ রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর সীমানা কি না।

আমার মনে হয় আধুনিকতা সম্বন্ধে আমাদের উপরি-উক্ত ধারণাটি ভুল, এবং 'রিয়ালিজ্‌ম্‌'-এর যথার্থ স্বরূপটি বুঝিতে হইলে প্রথমে আমাদের এই আধুনিকতার ধারণাটি বদলাইয়া লইতে হইবে। আমাদের বৈষ্ণবগণ বলিয়াছেন, জীবনের বিভিন্ন যুগভেদে শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলা রহিয়াছে, যেমন, বাল্য-লীলা, কৈশোর-লীলা, প্রৌঢ়-লীলা প্রভৃতি; কিন্তু এই সব লীলারই আবার একটা নিত্যত্ব রহিয়াছে। 'বাল্য' একটি নিত্য-স্বরূপযুক্ত নিত্যতত্ত্ব। ঠিক সেই ভাবেই বলিতে পারি, একটা জাতির সমগ্র জীবন জুড়িয়া মহাকালের যে বিভিন্ন লীলাচাঞ্চল্য তাহার প্রত্যেকটিরই আবার একটি নিত্যত্ব রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, আধুনিকতারও একটা নিত্য-স্বরূপতা আছে। কালের পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বিস্তীর্ণ সমাজ-জীবনে আসে নানা প্রকারের পরিবর্তন। সমাজ-জীবনের এই পরিবর্তন জাতীয় জীবনে গড়িয়া তোলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রুচি-প্রবণতা; এই রুচি-প্রবণতাযুক্ত যে বিশেষ

যুগধর্ম, তাহা অতীত ধর্ম হইতে স্বভাবতঃই অনেকখানি পৃথক্‌। এই যুগধর্মের পার্থক্যের চেতনাটাই বার বার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়া দেখা দেয় 'আধুনিকতা'র রূপ লইয়া।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 'আধুনিকতা' কথাটার কোন নিরপেক্ষ মান বা মূল্য নাই; ইঁহার ধর্ম এবং মূল্য সবটাই আপেক্ষিক। আমরা যে অর্থে ১৩৫৭ সালটিকে আধুনিক যুগ আখ্যা প্রদান করিয়া তাহাকে যে বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করিতে উৎসুক, বৈদিক যুগের অগ্নিপ্রদক্ষিণকারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলবসন কোন উগ্র যুগচেতনাসম্পন্ন মানুষ যদি সেই যুগটিকেই এই জাতীয় আখ্যা এবং মর্যাদা দান করিতে উৎসুক হইতেন তাহাতেও আপত্তি করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। অতীত যুগের অপেক্ষা তাঁহার যুগটিই তাঁহার নিকটে আধুনিক ছিল। তফাৎ শুধু হয়ত এইটুকু, তখনকার জীবনের গতিতে একটা আপেক্ষিক মন্থরতা ছিল, সুতরাং পরিবর্তনের প্রকার এবং পরিমাণ এবং তাহার ফলে পূর্ব যুগের সহিত পার্থক্যও হয়ত এ-কালের অনুপাতে অনেক কম ছিল। আমাদের কালে জীবনের যে গতি তাহার ভিতরে শুধু প্রাথমিক গতিই (initial velocity) বড় কথা নয়, নিরন্তর বর্ধমানতা (acceleration) এই প্রাথমিক গতির সহিত যুক্ত হইয়া বেগ এবং আবর্ত সবই অসম্ভব রকমে বাড়াইয়া দিয়াছে; ফলে অল্পকালের ব্যবধানও পার্থক্যের চেতনাকে তীব্র করিয়া দিতেছে।

আধুনিকতার আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিলাম সে সম্বন্ধে হয়ত বিতর্কের অবকাশ কম, কিন্তু এই আধুনিকতার আপেক্ষিকতাকে অবলম্বন করিয়াই আমি আর একটি কথা বলিতে

চাই, তাহাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমার মনে হয়, সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকতা কথাটার যেমন কোন নিরপেক্ষ অর্থ নাই, রিয়ালিজ্‌ম্‌ বা বাস্তববাদ কথাটারও তেমনই কোন নিরপেক্ষ অর্থ নাই; ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, রিয়ালিজ্‌ম্‌ বলিয়া আমরা সাহিত্যে এবং শিল্পে যে কথাটা বলি তাহাও সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের একটা যুগোচিত আপেক্ষিক ধর্ম। বৈদিক যুগটাই বৈদিক যুগের মানুষের নিকট যেমন আধুনিক কাল ছিল, তেমনই, আমার বিশ্বাস, বৈদিকসাহিত্যও তৎকালীন মানুষের নিকট 'রিয়াল্‌' ছিল। ত্রেতা যুগে বৈদিক সাহিত্যের এই 'রিয়ালিজ্‌ম্‌' অনেকখানি ঘুচিয়া গিয়াছিল, বাল্মীকিকৃত রামায়ণই বোধ হয় তখন ছিল 'রিয়াল্‌'। কালিদাসের কাব্যধর্ম সম্বন্ধে আমরা আজ যত উচ্ছ্বাসপ্রাবল্য দর্শাই না কেন, তাঁহার সাহিত্যকে রিয়ালিস্টিক্‌ সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে এখন আমরা কেহই রাজী হইব না; কিন্তু আমার মনে এ সংশয় আছে, আমি যদি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক জন বিদগ্ধ সদস্য হইতাম তাহা হইলে কালিদাসের সাহিত্যই আমার নিকট 'রিয়াল্‌' বলিয়া মনে হইত। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা সশ্রদ্ধভাবেই রোম্যান্টিকতা-মিশ্রিত আইডিয়ালিস্ট্‌ বলিয়া দূর হইতে নমস্কার করিতে শিখিয়াছি; কিন্তু তাঁহার নিজের যুগের পাঠকগণের নিকটে তিনি যে উগ্র রিয়ালিস্ট্‌ বলিয়া নিন্দার্হ হইয়াছেন তাহারও প্রমাণ আছে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও শরৎচন্দ্র উগ্র বাস্তব-পন্থী বলিয়া অভ্যর্থনা ও ভর্ৎসনা উভয়ই লাভ করিয়াছেন, এখন আবার বোধ হয় আমরা ভোল বদলাইয়াছি—শরৎচন্দ্রকেও আদর্শবাদী বলিয়া কড়ি ও কোমলের সুর লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন আবার দেখিতেছি, এ-যুগে

যাহা কিছু লিখিত হইতেছে মোটের মাথায় তাহা সবই 'রিয়াল্' বলিয়া পরিগণিত হইতেছে অথবা 'রিয়াল্' বলিয়া ধাঁধা লাগাইতেছে, এবং মোটের মাথায় যুগটাকে আমরা রিয়ালিজ্‌ম্-এর যুগ বলিয়াই অভিহিত করিতেছি। এই ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করিলে রিয়ালিজ্‌ম্-এর সংজ্ঞা দাঁড়ায় কি? কবির বা শিল্পীর যুগানুগত্য-হেতু তাঁহার রচিত সাহিত্য বা শিল্পের তৎতৎকালে একটা সহজ-গ্রাহ্যত্ব। এই সহজ-গ্রাহ্যত্বের পিছনে যুগ-মনের একটা 'সায়' দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, সাহিত্য বা শিল্পের যে বিশেষ ধর্ম এই যুগ-মনের 'সায়'টি আদায় করিতে পারে সব চেয়ে বেশী, তাহাই সাহিত্য বা শিল্পকে 'রিয়ালিস্টিক্' রূপ দান করে।

শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা যখন আধুনিক যুগটাকে রিয়ালিজ্‌ম্-এর যুগ বলি তখন যে কথাটা আমাদের মনে থাকে তাহা হইল এই, অধুনাপূর্ব শিল্পিগণের দৃষ্টি জীবনের নিরেট কেন্দ্রবিন্দুটির প্রতিই স্থিরবদ্ধ ছিল না, জীবনের আশ-পাশেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে বেশী। মর্ত্যলোক অপেক্ষা স্বর্গলোক এবং অন্তরিক্ষ লোকেই আমরা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি অধিক, পাতাল লোকেও আমাদের গতিবিধি ছিল অবাধ। ইহা ত' গেল অনেক আগেকার কথা; প্রাক্-রিয়ালিজ্‌ম্-এর যুগে আমাদের মন আবার শুধু 'কি জানি, কি জানি' করিয়াই ঘুরিয়া মরিয়াছে; জীবনকে দেখিয়াও দেখি নাই—কেবল অজানা রহস্যের গোধূলিতে হেঁয়ালীর জাল বুনিয়া নিজেকেও ঢাকিয়া রাখিয়াছি—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেও ঢাকিয়া রাখিয়াছি। হেঁয়ালীতে হেঁয়ালীতে গোটা সংসারই শেষ পর্যন্ত বাষ্পাকারে উবিয়া গিয়াছে, নীচে পড়িয়া রহিয়াছে একটা কল্পনা-বিলাসের স্নায়বিক উত্তেজনা। শিল্পের এই সমস্ত বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া এখন আমরা আসিয়া

পৌঁছিয়াছি এমন স্থানে যেখানে শিল্পীকে কাদামাটির পৃথিবীটা এবং তাহার উপরে প্রতিমুহূর্তে জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত জীবনটার একেবারে মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইতে হয়, এবং দাঁড়াইতে হয় বীরের বলিষ্ঠ দৃষ্টি লইয়া—পলায়নের সকল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া। শিল্পে তাই মণি-কুট্টিম, কুঞ্জ-কুটির বা ফুলের বাসরের স্থানে জল-কাদা-মাটির মাঠঘাট, কারখানার তপ্ত লোহার ছাউনি, বস্তির পঙ্কিলতা দেখা দিয়াছে; প্রেমের জ্বালা অপেক্ষা বুভুক্ষার জ্বালা তীব্রতর হইয়া দেখা দিয়াছে, বিলাসের দীর্ঘশ্বাস অপেক্ষা শ্রমক্লান্ত পাঁজরার ভিতর হইতে উদ্গত হাপরের ঘন-শ্বাস অধিক শ্রুতিগোচর হইয়া উঠিতেছে, ধ্যানের স্তব্ধতা অপেক্ষা কর্মের কোলাহল অধিকতর মহিমা লাভ করিতেছে। জীবনের সহিত এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই বলিব, শিল্পে এই রিয়ালিজ্‌ম্ জিনিসটি হইতেছে আধুনিক জিনিস; জীবন সম্বন্ধে এমন জাগ্রত বোধ, এমন সজাগ দৃষ্টিই আমাদের পূর্বে কখনও ছিল না—বর্তমান যুগই এই বোধ, এই দৃষ্টিকে বহন করিয়া আনিয়াছে। শিল্প এবং জীবন যে আধুনিক কালে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, অথবা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে সে কথা অস্বীকার না করিয়াও এ-বিষয়ে অন্য যে-সকল ভাবিবার কথা রহিয়াছে তাহারই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি।

প্রথমতঃ, বর্তমান যুগের পূর্বে সাহিত্যের সহিত জীবনের যোগ কোথাও ঘনিষ্ঠ হইয়া দেখা দেয় নাই—এ-কথা ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিব না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রামায়ণ—এবং তাহা হইতেও বিশেষ করিয়া মহাভারত—এমনতর একটি কথার লক্ষশ্লোকে রচিত বিপুলকায় প্রতিবাদ। জীবন-সত্যই ত' এ-কাব্যদ্বয়ের মূল উপজীব্য; তৎকালে প্রচলিত সত্যকারের

সমাজ-জীবনের একেবারে ফোটোগ্রাফ্‌ও যদি পাইতে চাই, রামায়ণ-মহাভারতে তাহার কোথাও কোন অপ্রতুলতা ঘটিবে না। সুদূর অতীতকালের রামায়ণ-মহাভারতের কথাও না হয় ছাড়িয়া দিলাম; চারি পাঁচ শতাব্দী পূর্বে রচিত আমাদের মঙ্গল-কাব্যগুলিকে একবার সংস্কারবর্জিত দৃষ্টিতে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলে সেখানেও দেখিব সকল দেব-দেবীর ভিড়, সকল অলৌকিকতার আবরণ ছিন্ন করিয়া সমাজ-জীবনের সহিত সাহিত্যের বহুস্থানে ফুটিয়াছে নিবিড় যোগ—কি ঘটনার বর্ণনে, কি চরিত্রাঙ্কনে। এমন কি আমি বলিব, বৈষ্ণব-কবিগণের অঙ্কিত রাধাও বহুস্থানে চিত্রে ও চরিত্রে আশ্চর্যভাবে রিয়াল্‌ হইয়া উঠিয়াছে—বাঙলাদেশের গ্রাম্য সরলা 'অবোলা' নারীরূপে। সাহিত্যের ভিতরে আমরা যে একান্ত অবাস্তব আকাশ-বিহারী কল্পনা-বিলাসের কথা বলি—যে রহস্য-নিদ্রালুতা—যে হেঁয়ালীর যবনিকান্তরালে জীবনের চরম 'বাষ্পায়নে'র কথা বলি—তাহা কতদিনের? তাহার চরম প্রকাশ প্রায় 'আজি হ'তে শতবর্ষে'র মধ্যেই। আমরা খুব জোর করিয়া যখন এই কথাটি বলি যে, পূর্ববর্তী শিল্পে বাস্তব জীবনের তেমন কোন স্থান ছিল না তখন আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের অব্যবহিতপূর্ববর্তী সাহিত্য এবং শিল্পের কথাই আমাদের মন জুড়িয়া থাকে।

কিন্তু এ-সকল তর্কও ছাড়িয়া দিতেছি। স্বীকার করিয়া লইতেছি, আজিকার দিনের সার্থক শিল্পিগণের সমস্তখানি মন যেমন করিয়া জীবনের প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে ইহার পূর্বে আর তেমন কোনদিন ছিল না—ইহাই হইল আধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য—ইহাই হইল আধুনিক শিল্পের রিয়ালিজ্‌ম্। কিন্তু আধুনিক শিল্পের এই বৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি আলোচনা করিতে গিয়া মনে হইয়াছে, ইহা

যুগেরই ধর্ম, কালের আবর্তনই এ ধর্মকে বহন করিয়া আনিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভিতরেও দেখিলাম, জীবনের সীমানা পৃথিবীগাত্রের উপরে কয়েক শত হাতের ভিতরেই কষাকষিভাবে নির্দিষ্ট হইয়া যায় নাই; তখন পর্যন্তও আমরা মানুষের ইতিহাসের যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম তাহাতে জীবনের 'ডাইনে-বাঁয়ে উর্ধ্বে-অধে অনেকখানি আশ-পাশ ছিল, এবং সেই আশ-পাশের দিকে তাকাইবার অবকাশ ছিল। তখন পর্যন্ত উর্ধ্বে আকাশ ছিল— তাহাতে জ্যোৎস্নারাত্রে শুভ্র মেঘখণ্ড ছিল। সেই শুভ্র মেঘের 'অমল ধবল পালে' আসিয়া 'মন্দ মধুর হাওয়া' লাগিতে পারিত, এবং তাহার দিকে তাকাইয়া নিম্নবাসীদের কাহারও কাহারও মন হয়ত কোন্ সুদূরে ভাসিয়া যাইতেও চাহিতে পারিত। কিন্তু আজ আমাদের মাথার উপরের সেই আকাশ বিমানে বিমানে ছাইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা বহন করে যে সকল অণু-পরমাণু তাহা যে-কোনও মুহূর্তে নিম্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে এবং বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার একটি পরমাণু একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে ধ্বংসস্তূপের ভিতরে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। জীবনের ডাইনে-বাঁয়ে উর্ধ্বে-অধে সর্বত্রই দেখিতেছি কেবল যেন ঝুলিতেছে 'গুরুতর পরিস্থিতি'র সম্পাদকীয় স্তম্ভ— তাহারা প্রতি মুহূর্তে খালি স্মরণ করাইয়া দিতেছে, নিছক বাঁচিয়া থাকা জিনিসটাকেই বা কি করিয়া সম্ভব করিয়া তোলা যায়! সকল দৃষ্টি ক্রমে যেন স্থিরবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে জীবনের ঐ একটি দিকে— কোনও রকমে নিছক টিকিয়া থাকিবার দিকে। পারিপার্শ্বিক এই আবেষ্টনীর ভিতরে যুগমনেরও ঔৎসুক্য স্বভাবতঃ ঐ বাঁচিয়া থাকিবার দিকে; যে সেই বাঁচিয়া থাকিবার কথা বলে, তাহার সহিতই মনের বেশী সায়, যে তদতিরিক্ত কথা বলিতে যায় বাহুল্যবোধে সে হয়ত

বিরক্তিসহকারে বর্জ্জিত। তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, মহাকালেরই আবর্তন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া যুগমনের ভিতরে আনিয়াছে কতগুলি বিশেষ প্রবণতা; যেখানেই সেই প্রবণতার পরিতৃপ্তি সেখানেই আসে একটা সানন্দ-গ্রাহ্যত্ব, আর বৃহত্তর সমাজ-জীবনে যে জিনিসটি সানন্দ-গ্রাহ্য তাহাই তৎকালে প্রতিভাত হয় জীবনের সত্যরূপে, সেই সত্যকে লইয়াই জাগে শিল্পের রিয়ালিজ্‌ম্। আজকের দিনে আমাদের আকাশ-গাঙে কোনও দিনই যে আর 'অমল ধবল পালে' 'মন্দ মধুর হাওয়া' লাগে না এমন নহে; সে যে বাস্তবে এখন আর কোনও দিন ঘটে না বলিয়াই অসত্য হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, ঘটিলেও শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিব্রত মনটির কাছে সে বিরক্তিকরভাবে অবাস্তর, এই জন্যই সে যেন অসত্য বলিয়া মনে হইতেছে; তাহার চেয়ে আকাশের মেঘের বর্ণনায় যদি শুনিতে পাই,—

কান পেতে শোন্ দেখি
গগন-অরণ্যে কি
গর্জে শাবক-হারা বাঘিনী!—

তখন তাহাকে অনেকখানি 'রিয়াল্' বলিয়া মনে হয়; কারণ সেখানে আকাশের মেঘের গর্জনের সহিত নিম্নের জীবন-গর্জনের অনেকটা সঙ্গতি স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। যুগধর্মের প্রভাবে এই যে চিত্ত-সঙ্গতি তাহাই শিল্পের ক্ষেত্রে 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর নিয়ামক হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। কথাটা হয়ত অনেকখানি আমাদের প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী হইল; সুতরাং ইহার যাথার্থ্য যাচাই করিয়া দেখিতে হইলে 'রিয়ালিজ্‌ম্' বিষয়ে আমাদের প্রচলিত ধারণা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন।

আমাদের প্রচলিত মতে রিয়ালিজ্‌ম্‌ কাহাকে বলি? কথাটা যত স্পষ্ট করিয়া আমরা বলি, তত স্পষ্ট করিয়া বোধহয় ভাবিও না, জানিও না। এ সম্বন্ধে চলতি কথা যাহা দু'-একটা আছে, আসলে তাহা অচল। 'বস্তু বা ঘটনা যেমন, ঠিক তেমনই তাহার রূপ দিব' —প্রভৃতি জাতীয় কথা অর্থহীন; কারণ, প্রথমতঃ, এই 'যেমন' এবং 'তেমন' কথা দুইটিরই কোন স্পষ্ট অর্থ নাই; দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের যদি কোন অর্থ নির্দিষ্ট করিয়াও লওয়া যায়, তবে 'যেমন'-এর ঠিক 'তেমন'-এর সহিত হুবহু যোগ ঘটান কাহারও পক্ষে আদৌ সম্ভব কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় বর্তমান। এই প্রসঙ্গে 'যথাস্থিত-বাদ' কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন বস্তু বা ঘটনার মানুষের মনোনিরপেক্ষ কোন যথাস্থিত রূপ আদৌ আছে কি না, থাকিলে মানুষের মনের পক্ষে এই জাতীয় কোন যথাস্থিত রূপ গ্রহণ করা সম্ভব কি না। শেষ পর্যন্ত আমরা হয়ত এই একটা রফায় উপস্থিত হই যে, বস্তু বা ঘটনার একেবারে যথাস্থিত কোন রূপ নাই, বা থাকিলেও কোন জাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রেই সেই বিশুদ্ধ যথাস্থিত সত্যের রূপায়ণ সম্ভব নহে বটে; কিন্তু রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রহীতা মনের প্রাধান্য বেশী না বস্তু বা ঘটনার স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বাহিরের রূপ-গুণেরই প্রাধান্য বেশী, ইহা লইয়াই রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর বিচার।

আসলে রিয়ালিজ্‌ম্‌ কথাটাকে আমরা একটা স্পষ্ট ইতি-বাচক রূপ অপেক্ষা নেতিবাচক রূপে হয়ত বুঝি ভাল। এই নেতি-বাচক রূপে রিয়ালিজ্‌ম্‌ হইল রোম্যাণ্টিক্‌বাদের বিরোধী ধর্ম এবং ভাববাদ বা আদর্শবাদেরও বিরোধী ধর্ম। প্রথমে রোম্যাণ্টিক্‌বাদের কথাই আলোচনা করা যাক্‌। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রোম্যাণ্টিক্‌বাদ

এবং রিয়ালিজ্‌ম্ শিল্পিমনের দুইটি পরস্পরবিরোধী ধর্মপ্রসূত। একজাতীয় শিল্পীর সহজাত মনোধর্মই এইরূপ যে, তাঁহারা কোন বস্তু বা ঘটনার বাহিরের রূপটিতেই আকৃষ্ট হন বেশী; রূপায়ণের ক্ষেত্রেও সেই দিক্‌টাই প্রধান হইয়া ওঠে। আর এক জাতীয় শিল্পীর সহজাত মনোধর্ম তাঁহাকে স্বভাবতঃই বহির্বিমুখ করিয়া তোলে, তিনি বাহিরের বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ফিরিয়া আসেন তাঁহার অন্তর্জগতে—আন্তর অনুভূতির ক্ষেত্রে। মোটের উপরে মনোধর্মের এই বহির্মুখিতাই রিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রবর্তক; বহির্বিমুখ অন্তর্মুখিতাই দান করে রোম্যান্টিক্‌বাদের প্রবর্তনা। সূর্যরশ্মি যেমন চতুষ্পার্শ্বস্থ শূন্যপরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া সপ্তবর্ণের বৈচিত্র্য লাভ করে, এই এক মনোধর্মই সেইরূপ শিল্পের বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র ধর্ম গ্রহণ করে।

সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে—এই সকল কথাকে আমার মনে হইয়াছে ইতিহাসনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্ত্ব মাত্র। এই বিশুদ্ধ তত্ত্ব অবলম্বনে কতগুলি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছান খুব সহজ; কিন্তু মাঝখান হইতে ইতিহাস আসিয়া মুস্কিল বাধায়; সে তাহার প্রচণ্ড আলোড়নে—নিরন্তর ঘূর্ণ্যাবর্তে—বিশুদ্ধ তত্ত্বের ভিতরে খানিকটা কাদা-মাটির সংযোগ ঘটাইয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করিয়া দিয়া যায়। আধুনিক যুগটা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম, আধুনিক যুগ লইয়াই কথা বলি। আধুনিক যুগটা রিয়ালিজ্‌ম্-এর যুগ বলিয়া একটা সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; এই স্বীকৃতি আবার সব চেয়ে বেশী উপন্যাস-ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। এ-যুগের কথা-সাহিত্যকে তাই একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। এ যুগের কথা-সাহিত্যিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে

পারেন, এরূপ একজন কোন লেখকের নাম করা শক্ত; তথাপি জনপ্রিয়তার দিক্ হইতে বিচার করিয়া আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উল্লেখ করিতেছি। লেখক হিসাবে তারাশঙ্করের ধর্ম কি? তাঁহার লেখার ভিতরে বাঙলা দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের এমন নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়, এই অঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানব-জীবনের সহিত তাঁহার হৃদয়ের এমন গভীর সংযোগের পরিচয় ছড়াইয়া আছে তাঁহার সকল লেখার ভিতরে যে, তিনি রিয়ালিস্ট্ লেখক নন এমন অপবাদ তাঁহাকে কিছুতেই দিতে ইচ্ছা হয় না। বাঙলা দেশের সাধারণ পাঠকসমাজে তাঁহার সম্বন্ধে এই রিয়ালিস্ট্ বলিয়া স্বীকৃতিও দুর্লভ নয়। কিন্তু পাঠক হিসাবে তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস পাঠ করিয়া মনে যে ফলশ্রুতি লাভ করিয়াছি তাহার একটা মিশ্রধর্ম সর্বদা লক্ষ্য করিয়াছি এবং এ-সম্বন্ধে নিজের অনুভূতিকে যখন নিজেই নানা ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি, তখন নিজের মনের মধ্যেই অনেক সংশয় উপলব্ধি করিয়াছি।

তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস পাঠ করিয়া এই প্রশ্ন মনে আসিয়াছে যে, নাগরিক জীবনে নিরন্তর সংগ্রামলিপ্ত ঘর্মসিক্ত আমাদের তথাকথিত শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন মনের কাছে এই সব সাহিত্যের যে আবেদন, বীরভূম অঞ্চলের সাধারণ জনসমাজে তাহার সেই আবেদন আছে কি না। আমাদের নিকটে এই সাহিত্যের যে ভাল লাগা তাহার ভিতরে মনে হয় অনেক কারণ যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এখানে বাঙলা দেশের একটা বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি ও জীবনের একটা নিখুঁত ছবি পাইয়াছি, অবজ্ঞাত সাঁওতাল, হাড়ী, বাগ্দী, বাউরী জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতি পাইয়াছি, ক্ষয়িষ্ণু পরগাছা মধ্যবিত্ত

জীবনের ক্রম-অন্তর্ধানের ছবি ও নূতন সমাজ-জীবনের অবির্ভাবের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছি; আমাদের ভাল লাগার ভিতরে এ উপাদানগুলির প্রভাব যথেষ্ট। কিন্তু ইহাই কি সমস্ত? এই ভাল লাগার ভিতরে অনেকখানি হয়ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে একটা দূরত্বের ব্যবধান, পরিচয়-অপরিচয়ের আলো-আঁধারি রহস্য—সংগ্রামক্ষত নাগরিক জীবনের শ্রান্তি ও তিক্ততা হইতে মুক্তি ও বিশ্রান্তির আনন্দ। নাগরিক জীবনের অনেক দূর হইতে হাজা-মজা নদীর বাঁকে ঘনবিন্যস্ত শালবন-বাঁশবনের আড়ালে ভাঙা মাটির দেয়াল ও খড়ের ছাউনির নীচে কতগুলি জীবনধারা দেখিতেছি—সে ধারা উৎসহীন নদীর মতন খর তাপে চট্‌ করিয়া শুকাইয়া যায়—বর্ষার বানের মতন আচমকা দুর্বার হইয়া ওঠে। তাহারই আশে-পাশে আস্তে আস্তে খসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবন—আগাছায়-ভরা কত কালের পুরানো ভাঙা-চোরা পোড়ো বাড়ির মতন। এখান হইতে জাগিয়া উঠিতেছে একটা অখ্যাত-অজ্ঞাত আদিম জীবনের গন্ধ—তাহার খানিকটা ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে পাই—অনেকখানি পাই না। এই পাওয়া-না-পাওয়ায় বোঝা-না-বোঝায় মিলিয়া-মিশিয়া সব জিনিসটাই কেমন একটা অজ্ঞাত রহস্যে মণ্ডিত হইয়া ওঠে। তবে কি লেখক রোম্যাণ্টিক্?

শুধু রোম্যাণ্টিকতা নয়, এখানে একটা মুক্তির—একটা বিশ্রান্তির—আনন্দও রহিয়াছে—গাল দিবার ভাষায় যাহাকে বলা যাইতে পারে 'পলায়নী বৃত্তি'। যে একটা আদিমতাগন্ধী সহজ সরল মন্থর জীবনে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পাই তারাশঙ্করের কথা-সাহিত্যে, তাহা সাময়িক ভাবে আমাকে আমার অস্বস্তিকর বর্তমান জীবনের পরিবেশ হইতে অনেক দূরে টানিয়া লয়। এই দূরত্বের ব্যবধান-রহস্য

—এই মুক্তি বা বিশ্রান্তির আনন্দকে—আমি অযথা বড় করিয়া দেখাইতে চাহিতেছি না; আমি শুধু দেখাইতে চাহিতেছি যে, আমাদের সমগ্র 'ভাল লাগা'র ভিতরে এই সকল উপাদানের স্থানও একান্ত অবজ্ঞেয় নয়। এখানে অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে, তারাশঙ্করের সৃষ্ট সাহিত্যের এই রোম্যান্টিক্ রূপটা আমার পাঠক-চিত্তের বিকারজনিত কি না; এ বিষয়ে নিজে অভ্রান্ত বিচারক নই; কিন্তু যতখানি বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব তাহা দ্বারা এই প্রত্যয় লাভ হইয়াছে যে, এ ধর্ম শুধুমাত্র আমার পাঠক-চিত্তগত নহে, ইহা তাঁহার রচিত সাহিত্য-গতও বটে।

এখানে তাহা হইলে দেখিতেছি, রিয়ালিজ্‌ম্ এবং রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ হরিহরাত্মা; অহি-নকুলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী ত নয়ই, বরঞ্চ উভয়ে উভয়ের পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছে। শুধু এইটুকুই নয়; আরও লক্ষ্য করিবার বস্তু রহিয়াছে। পূর্বে তারাশঙ্করের কথা-সাহিত্যে যে সকল উপাদানের উল্লেখ করিলাম তাহার অনেক উপাদানই রোম্যান্টিক্, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার কিছু কিছু উপন্যাসের ভিতরে যে ভাবে রোম্যান্টিক্ বলি, বা রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবে রোম্যান্টিক্ বলি, তারাশঙ্করকে ঠিক সেই ভাবে রোম্যান্টিক্ বলিতে ইচ্ছা হয় না। বরঞ্চ এই সকল রোম্যান্টিক্ উপাদান সত্ত্বেও সাধারণ পাঠক-সমাজে তারাশঙ্করকে রিয়ালিস্টিক্ লেখক বলিয়া গ্রহণ করিবার ঝোঁক বেশী; আর আমি প্রারম্ভেই বলিয়াছি, সাধারণ পাঠক-সমাজের এই ঝোঁক একেবারে অবজ্ঞেয় নয়। আমার বিশ্বাস, ইহার পশ্চাতে একটা গভীর কারণ নিহিত থাকে।

তারাশঙ্করকে এই ভাবে রিয়ালিস্ট্ বলিয়া গ্রহণ করিবার ঝোঁক

কেন? আমার মনে হয়, তাহার কারণ—লেখকের সহজ এবং অকৃত্রিম যুগানুগত্য এবং তজ্জনিত তাঁহার সাহিত্যের সহজ ও সানন্দ-গ্রাহ্যত্ব। লেখক যুগধর্মকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। যুগের যেটা রোম্যান্টিকতা তাহা বৃহত্তর সমাজ-চৈতন্যের নিকট সহজ-গ্রাহ্য —সানন্দ-গ্রাহ্য; তাহার সহিত পারিপার্শ্বিক মনের একটা সাধারণ সায় রহিয়াছে, মোটামুটি ভাবে তাহা বর্তমান-জীবনের সহিত একটা সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিয়াছে—এই জন্যই যুগের পক্ষে তাহা 'রিয়াল্'—তাহা সত্য। সমাজের নিম্নস্তরের অখ্যাত অবজ্ঞাত এবং শোষিত জীবন সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য, একটা গভীর সহানুভূতি, তাহাকে জানিবার বুঝিবার আত্মীয় করিয়া লইবার একটা প্রবৃত্তি—আমাদের যুগেরই ধর্ম; সমাজের নিম্নস্তরে যাহারা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের জীবনেরও যে মূল্য আছে—মহিমা আছে—মানুষের অধিকারে তাহারাও যে বঞ্চিত হইবার নয় —সমাজ-জীবনের অন্তস্তলে নানা দুর্বার শক্তির আলোড়নের আঘাতে-প্রত্যাঘাতে তাহাদের জীবনেও যে নূতন দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে একটা নূতনতর সমাজ-জীবনের আবির্ভাবের ইঙ্গিত জাগিয়া উঠিতেছে— এই সকল জিনিসের সহিত বর্তমান যুগে আমরা আমাদের হৃদয়ের একটা গভীর যোগ অনুভব করি; আর এই সকলের বাহনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ তাহার সহিতও আমরা অনুভব করি আমাদের হৃদয়ের এক নিবিড় যোগ; তাই তাহা মারাত্মক ভাবে আধুনিক রিয়ালিজ্‌ম্-এর বিরোধী রূপে দেখা দেয় না, দেখা দেয় 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর অঙ্গীভূত রূপে। এ কথা শুধু তারাশঙ্করের কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, কম-বেশী এ যুগের অনেক কথা-

সাহিত্যিকের রচনা সম্বন্ধেই সত্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', 'পথের পাঁচালী'; মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মা নদীর মাঝি'; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর ভাবে এই এক কথাই প্রযোজ্য মনে হয়। যুগোপযোগী হইলে রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ যে কত সহজ এবং সানন্দ-গ্রাহ্য হইয়া রিয়ালিজ্‌ম্-এর রূপ ধারণ করিতে পারে সেই কথাটিই এ-সব স্থলে লক্ষণীয়।

শুধু কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, এ যুগের কবিতার ক্ষেত্রেও এই কথাটা আমার সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের উল্লেখ করিতেছি। করিতেছি এই জন্য যে, যতীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িলে মনে হয় তাঁহার কবিতার একটা স্পষ্ট সুর আছে। সে সুরটিকে আমি শুধু দুঃখবাদের সুর বলিব না, বলিব যে সেখানে আছে একটি রোম্যান্টিকতা-বিরোধী সুর। রোম্যান্টিক্ কল্পনাবিলাস এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা এতদিন ধরিয়া গাড়য়া তুলিয়াছি যে বহু-বিচিত্র মন-ভুলান ভাবের সৌধ, তিনি তাহার ভিত্তি-ভূমিতে অনেক স্থানে বলিষ্ঠ আঘাত করিয়া তাহাকে নাড়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই রোম্যান্টিক্ ভাবালুতার বিরোধিতা এ-যুগে আমাদের ভালই লাগিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কবিতা কি সত্যই রোম্যান্টিক্ ভাবালুতার বিরোধী? একটু দীর্ঘ হইলেও তাঁহার রচিত 'বেদিনী' কবিতাটি নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

ফাগুন আকাশে নামে কাল-সাঁঝ ঝোড়ো মেঘে দিক্ ঘেরা,
ওঠ রে বেদিনী মোট বেঁধে নিই তুলিতে হইবে ডেরা।
দখিনার লোভে খোলা মাঠে তুই বসালি তাঁবুর খোঁটা,
ভাঙা ফাটা ফুটো তৈজস গুটো, সাপের ঝাঁপিটে ওঠা।

ফাগুন হাওয়া এ নয় রে বেদিনী, দখিন হাওয়া এ নয়,
ঈশান কোণের ফণীর ফণায় বিষের নিশাস বয়।
ওই আসে সেই ঝড়,—
ওঠ রে বেদিনী, মোট তুলে নিয়ে বেদিয়ার হাত ধর।

•

কি হ'ল বেদিনী তোর?
উড়ো মেঘে রাখি' নিশ্চল আঁখি কোন্‌ বেদনায় ভোর?
এবার সহসা উঠাইতে বাসা কেমন করে কি মন?
মাঠে মাঠে আর ঘাটে ঘাটে ঘুরে ক্লান্ত কি এ জীবন?
বেদিয়ার বালা সাধিয়া দিলি যে বেদিয়ার গলে মালা,
জানিতিস্‌ তুই এদের বংশে নাই যে ঘরের জ্বালা।
বেদের ধারা ত বুঝিস্‌ বেদিনী,—যে ঘর বাঁধে সে দিনে
রাত না পোহাতে চিহ্ন তাহার ঢেকে যায় শ্যাম তৃণে।
তবে বা কিসের লাগি
এত কাল পরে হ'লি তুই আজ সেই ঘরে অনুরাগী?
বেলায় বেলায় পথের খেলায় বেদিনী রে কাটে দিন,
আমাদের 'পরে পথের কুকুরও নহে কভু উদাসীন।
সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে, মাথায় সাপের ঝাঁপি,
কত না রজনী কাটাল বেদিনী, ভরা বুকে বুক চাপি।
তুই আর আমি পথে পথে ভ্রমি সাথে শত তালি ঘর,
ঝাঁপির ভিতরে কালভুজঙ্গী চির সাথী শির 'পর।
এ সবে কি রুচি নাই?
ঘরের মায়ার ঝড়ের আকাশে নয়ন মেলিলি তাই?

বেদের আদরে বেদিনী রে তোর চুলে বাঁধিয়াছে জট,
তারি সোহাগের ভাঙনে ভেঙেছে শ্যামল তনুর তট।
ফাগুন পবনে ঘুরি বনে বনে হাতে ছাগলের দড়ি,
বেছে বেছে তার মুখে তুলে দিস্ ফুলে ভরা বল্লরী।
গোপনে ছোপান হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া রঙিন ফালি
চির-হাঘোরের ঘরণী রে তুই ঘাঘরায় দিস্ তালি।
তবু যে বেদিনী বেদেরি ভক্ত—বিস্ময় সবে মানে,
গুরুর কৃপায় বেদেরা যে হায় মোহিনী মন্ত্র জানে।

শোন রে বেদিনী শোন্
সুরু হ'ল ওই অদূর আঁধারে গুরু গুরু গর্জন!
ঘরের মায়া সে থাকে ত এখনও কেটে দে তাঁবুর রসি,
না হয় কাটাব এ কালরাত্রি খোলা মাঠে খাড়া বসি'।
আকাশ জুড়িয়া কোন সাপুড়িয়া বাজায়ে চলেছে তুরী,
ঝাঁপির ভিতরে জাগিয়া সাপিনী ভাঙিতেছে মোড়ামুড়ি।
ভেবেছে সে আজ এল নটরাজ, নৃত্যের আহ্বান,
ডালার রসির ফাঁসে ওই ছাখ ঘন ঘন পড়ে টান।

কেন উদাসীন আন্‌মনা হেন বেদিনী, বেদের মেয়ে?
দূরের বাঁশীর সুরে তুইও কি রে উঠিবি কাঁদুনি গেয়ে?

* * *

অকালে এল এ কালবৈশাখী কাছে আয় কাছে আয়,
যাহা নাই তারি মায়ায় বেদিনী যা ছিল তাও যে যায়।
ছুটে যায় খুঁটো, উড়ে ছেঁড়া তাঁবু, টুটে যায় দড়াদড়ি,
ফুটো ভাঁড় আর কাণা-ভাঙা হাঁড়ি, দূরে দূরে গড়াগড়ি।

অকালের এই কালবৈশাখী ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে বেদিনী রে হাত ধর।
ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ ত ওড়ে না—ভয় নাই ভয় নাই,
এ মাঠ ছাড়িয়া চল্‌ রে বেদিনী আর কোন মাঠে যাই।
হাওয়ার উজানে দিক্ ঠিক রেখে আঁধারে আঁধারে চল—
আকাশে খেলায় লয়া লয়া সাপ পারের সাপুড়ে দল।
কি ভাবিস্ মিছে, আয় পিছে পিছে যা হবার তাই হোক্—
বেদে-বেদিনীরা ভয় পায় যদি—হাসিবে গাঁয়ের লোক।

—সায়ম্—

এটা কি-জাতীয় কবিতা? 'উত্তররাম-চরিতে' যেমন দেখিতে পাই, বাল্মীকির আশ্রমে একটা নূতন জন্তুর আবির্ভাব দেখিয়া লব-কুশ জীববিদ্যা-শাস্ত্রের লক্ষণ মিলাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—'অশ্বোঽয়ম্ অশ্বোঽয়ম্', তেমনই আমাদের কাব্যবিদ্যা-শাস্ত্রের লক্ষণ মিলাইয়া আমাদেরও বলিতে হয়, ইহা রোম্যান্টিক্ কবিতা। কিন্তু মজা এই, এত রোম্যান্টিক্ ধর্মোপেত হইয়াও ইহা আমাদের নিকট রোম্যান্টিক্ বলিয়া ধিক্কৃত ত নয়ই, বরং অভ্যর্থিত। ইহার কারণ এখানকার সকল রোম্যান্টিক্ ধর্ম যুগধর্মের সহিত একটা আশ্চর্য সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছে; ফলে খুব অবহিত হইয়া বিচার করিতে না বসিলে মোটের উপরে সমস্ত কবিতাটাকে রোম্যান্টিক্ বলিয়া সহসা গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা হয় না। বেদে-বেদেনীর অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত জীবনকেও আগাইয়া আসিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিবার একটা আকুল আগ্রহ দেখা দিয়াছে আমাদের ভিতরে; তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে বেদে-বেদেনীর বাস্তব জীবনের সকল খুঁটিনাটি বর্ণনা, সব জুড়িয়া তাই জাগে যেন একটা

রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর আমেজ। কল্পনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে মৃদু আঘাত করিতে থাকে অজ্ঞাত জীবনের লীলা-চাঞ্চল্য—তাহার জটিল রহস্যময় পরিবেশ—অসীম অনিশ্চয়তা—অব্যবস্থিততা—আদিমতা—রিক্ততা ও রুক্ষতার মাঝখানে প্রেমবৈচিত্র্যের বিস্ময়কর মহিমা। কিন্তু যুগানুগত্যের ফলে তাহা মনে কোন বেসুরা আঘাত তোলে না; বৃহত্তর জীবনের পারিপার্শ্বিকতার সহিত অন্তরঙ্গ যোগে তাহাও সানন্দ-গ্রাহ্য—এইখানেই তাহাতে রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর আমেজ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে বর্তমান কালে আমাদের মনে যে বিরূপতা উহা নিছক রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে নয়, যে রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌ যুগ-মনের সহিত সুর রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না অভিযোগটা তাহারই বিরুদ্ধে। এই যুগ-মনের সহিত অমিলটাই তাহা হইলে দেখিতেছি সকল বিরোধ-অপ্রীতির মূলীভূত কারণ। রাজপুত্র-রাজকন্যাকে লইয়া সাত-সমুদ্র তের-নদীর পারে যে প্রেমের কল্পনা-বিলাস—সেই নিদ্রিত স্বপ্নপুরী—সেই পুষ্পপেলব সজ্জা, সুরভি-বিহ্বলতা—তাহার ভিতরে সোনার কাঠি রূপার কাঠির স্পর্শজনিত ঘুম ও জাগরণ—যত সুন্দর ভাষা ও ছন্দে যত বিচিত্র করিয়াই তাহাকে লেখা যাক্‌ সে আর আজকের দিনের মনে সায় পাইবে না—যেখানে সে তাহার সেই সানন্দ-গ্রাহ্যত্ব হারাইয়া ফেলিল সেইখানেই সে স্ব-ধিক্কৃত। কিন্তু সেই যে সাতসমুদ্র তেরনদী পারের স্বপ্নপুরীর প্রেম সে ত মানুষের জীবনে মরিবার নহে—সে ক্রম-রূপান্তর লাভ করিতেছে এবং আমার সন্দেহ, আজ সে ঐ বেদে-বেদেনীর ভিতরেই অনেকখানি আত্মগোপন করিয়া আছে। আমাদের যে মনোবৃত্তি একদিন আমাদের ঘরের প্রেমকে সাতসমুদ্র তেরনদীর পারের স্বপ্নপুরীতে নির্বাসিত করিয়া একটা গোপন

তৃপ্তি লাভ করিতেছিল, সেই মনোবৃত্তির যুগানুগ সূক্ষ্ম রূপান্তরই কি আজ আমাদের প্রেমকে কালবৈশাখীর অখ্যাত অজ্ঞাত ঘাটে-মাঠে সরাইয়া দিয়া, বনে-বাদাড়ে—বিরল-বসতি পাহাড়ি মহুয়া-বনে—অথবা মর্ত্যলোক হইতে প্রায়-বিচ্ছিন্ন পদ্মার চরের আগাছার আড়ালে জলে ভেজা খড়ের ঘরে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া বিচিত্র রহস্যের সন্ধান করিতেছে? 'তেপান্তরের মাঠ' আজ ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকার জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া নাই ত?

কিছুদিন পূর্বে একজন উগ্র আধুনিকতা-পন্থী এবং বাস্তববাদী কবি-লেখকের সঙ্গে কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, সব সময় তাঁহার কবিতার স্ফূর্তি হয় না, তাহার জন্য একটা অনুকূল আবহাওয়ার প্রয়োজন। মনে করা যাক্, কলিকাতা শহরের একটি স্যাঁৎসেঁতে অন্ধ গলি—তাহার ভিতরে একটি ছ্যাত্‌লা-পড়া ফাটা দেয়ালের পোড়ো বাড়ির ভিতরে একটি প্রেস—পায়ে ঠেলা একটা বহু পুরাতন যন্ত্রে ঘড়ড়্ ঘড়ড়্ শব্দে দেওয়াল কাঁপাইয়া রাজচক্ষুর অন্তরালে ছাপা হইতেছে নিষিদ্ধ পুস্তিকা—প্রতি মুহূর্তে রাজপুরুষের শুধু আগমন নয়, দস্তুরমত আবির্ভাবের আশঙ্কা—ঠিক যেন একটা 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্'-এর ভাব! ইহার ভিতরে কেরোসিনের ডিবি জ্বালাইয়া একটা হাত-ভাঙা বা খোঁড়া চেয়ারে বসিয়া চারিদিকের বদ্ধ হাওয়া ও সোঁদা গন্ধের ভিতরে কলম ধরিতে পারিলেই তাঁহার কবি-মন জাগ্রত হইয়া যথার্থ সক্রিয় হইয়া ওঠে। তাঁহার সাধনার কৃচ্ছ্রতার প্রতি সকল শ্রদ্ধা-সহানুভূতি সত্ত্বেও আমার মনে একটা কথা উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল, সম্প্রদায় বিচারে ইনিও একজন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' ন'ন্ কি?

রিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রসঙ্গে এতক্ষণ রোম্যান্টিকতা সম্বন্ধে আলোচনা

করিতেছিলাম ; এইবারে আদর্শবাদের কথা আলোচনা করা যাক্। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমাদের রিয়ালিজ্‌ম্-এর ধারণার সহিত যুক্ত হইয়া ছিল একটা পরম আসক্তির ভিতরে পরম নিরাসক্তির প্রশ্ন ;— বাহিরের জগৎ বা জীবনের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ, অথচ তাহাকে গ্রহণ এবং প্রকাশ করিবার চেষ্টার ভিতরে নিজেকে যথাসম্ভব লুপ্ত করিয়া রাখা। এই জাতীয় রিয়ালিজ্‌ম্-এর বিরুদ্ধে এত দিন আমাদের যেটা তর্ক ছিল, সেটা সামাজিক জীব মানুষের চিত্তধর্মের পক্ষে ইহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। এখন প্রশ্ন শুধু সম্ভাব্যতার নহে ; সম্ভব হইলেও এখন প্রশ্ন যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার ঔচিত্য সম্বন্ধে। অথবা বলা যাইতে পারে, নিরাসক্তির প্রশ্নটাকে আজকাল আমরা অস্বীকার করি না, অস্বীকার করি তাহার প্রাচীন ব্যাখ্যাটাকে। নিরাসক্তির অর্থ 'শুধু অকারণ পুলকে' দেখার আনন্দে দেখা এবং প্রকাশের আনন্দে প্রকাশ নয় ; নিরাসক্তির অর্থ বৃহত্তর সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ আসক্তিকে সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত বিস্তীর্ণ আসক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করিয়া দেওয়া। সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতার আধুনিক যুগে ইহাই গূঢ় তাৎপর্য। ব্যক্তিচেতনা সেখানে লুপ্ত হয় নাই, সমাজ-চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া সে নিঃসীম বিস্তারের ভিতরে প্রায় নিরুপাধিক হইয়া উঠিয়াছে।

গভীর সমাজবোধের উপরেই যেখানে রিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রতিষ্ঠা, সেখানে আদর্শনিষ্ঠার সহিত রিয়ালিজ্‌ম্-এর কোন বিরোধের প্রশ্ন উঠিতে পারে না ; বরঞ্চ গভীর আদর্শনিষ্ঠাই সেখানে রিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রাণ। আদর্শবাদের সঙ্গে যেখানে রিয়ালিজ্‌ম্-এর বিরোধিতা, বুঝিতে হইবে, আদর্শ সেখানে সত্য-জীবনেরই পরিপন্থী।

সমাজ-জীবন হইতে আমরা যেখানে 'যোগভ্রষ্ট', আসলে আমরা সেখানে আদর্শভ্রষ্ট ; সেই ভ্রষ্ট আদর্শকেই সাহিত্য ও সাধারণ শিল্পের মারফতে আমরা যদি সমাজ-জীবনের উপরে জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে চাই, সেখানেই আসে বিরোধিতা ; সেই বিরোধিতাকে আমরা ভুল করিয়া বলি সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে রিয়ালিজ্‌ম্-এর সহিত আইডিয়ালিজ্‌ম্-এর বিরোধিতা। আসল জিনিসটা তাহা হইলে মোটামুটি গিয়া দাঁড়ায় এই, কোন একটি বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের সত্য আদর্শ লইয়া এবং সর্বতোভাবে সেই আদর্শ প্রচার করিতে, সেই আদর্শে সমগ্র জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে যে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টি তাহাই রিয়ালিস্টিক ; আর যে সাহিত্য বা শিল্প যুগবিরোধী, অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের সত্য-জীবনের পরিপন্থী তাহাই তথাকথিত আইডিয়ালিজ্‌ম্ বলিয়া ধিক্‌কৃত।

কথাটা একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে আলোচনা করা যাক্। কথাশিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র একান্ত ভাবেই পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, এমন একটা কথার 'বহুল প্রচার' বাঙলা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়ান রহিয়াছে। কথাটাকে প্রচলিত ভাষায় রূপ দিতে গেলে বলিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র খানিকটা ছিলেন রোম্যান্টিক্, আর অনেক অংশেই ছিলেন অসহ্য ভাবে আইডিয়ালিস্ট্ ; অপর পক্ষে শরৎচন্দ্রে এই উভয়বিধ রাহুর কোনটারই কোন স্পর্শ ঘটে নাই, তিনি তাই শুভ্র সমুজ্জ্বল অকলঙ্ক রিয়ালিস্ট্। আসলে কিন্তু কথাগুলি সর্বৈব মিথ্যা। শরৎচন্দ্র রোম্যান্টিক্ ছিলেন না এ কথাও সত্য নয়, আইডিয়ালিস্ট্ ছিলেন না এ কথাও সত্য নয়। তবে এই জনশ্রুতি-গুলির পিছনকার সত্য কি ? সত্য এই, বঙ্কিমী ঢঙের রোম্যান্স্‌টাও আজকাল আর তেমন ভাল লাগে না, তাঁহার আইডিয়াগুলিও

এখন আর তেমন ভাল লাগে না; অপর পক্ষে শরৎচন্দ্রের রোম্যান্স্‌টাও একটু বেশী ধাতসহ, আইডিয়াগুলির সঙ্গেও মনের সায় মেলে অনেক বেশী; ইহারই গলিতার্থে গিয়া সংক্ষেপে দাঁড়াইল, একজন অসহ্য আইডিয়ালিস্ট্‌, অপর জন অসম্ভব রকমে রিয়ালিস্ট্‌। জীবনের রোম্যান্স্‌কে শরৎচন্দ্র জীবনের আরও অনেক কাছে আনিয়া দিলেন,—শরৎ-সাহিত্যে তাই জীবনের রোম্যান্স্‌ আর বাস্তবতা পরস্পরে সর্বদাই পরস্পরের অনুপূরক হইয়া উঠিয়াছে। আর শরৎচন্দ্র আমার মতে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশী আইডিয়ালিস্ট্‌। 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী এবং 'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষ্মীকে লইয়া আদর্শনিষ্ঠার যে বাড়াবাড়ি হইয়াছে সূর্যমুখী, ভ্রমর প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া আদর্শনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি তাহা অপেক্ষা অনেক কম বলিয়া মনে করি।

আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে তিনিই ছিলেন রিয়ালিস্ট্‌। তাঁহার রোম্যান্স্‌ ধর্মের ভিতরে ছিল যুগানুকূলতা; আর তৎকালীন সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে কাজ করিতেছিল যে শক্তিসমূহ তিনি তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন; সেই বৃহত্তর। সমাজ-জীবনের অন্তঃপ্রবাহের সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয়-জীবনের আদর্শ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিবার অকৃত্রিম সাধনা করিয়াছেন তিনি তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া। তিনি জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন; সেই আদর্শের প্রতি তাঁহার অটল নিষ্ঠা ছিল; কল্যাণময় সেই আদর্শে তিনি যে জাতীয় জীবনকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহাই ত যথার্থ রিয়ালিস্ট্‌ শিল্পীর কাজ। তাঁহার সাহিত্য যথাসম্ভব সব দিক হইতে যুগ-জীবনের সত্যকে বহন করিয়া আনিতেছিল; এই যুগ-জীবনের সত্যকে বহন করিয়া আনারই অর্থ হইল রিয়ালিজ্‌ম্‌।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের যে জীবন পঞ্চাশ বৎসর পরেও সে ঠিক তেমন ভাবেই অচল হইয়া থাকে নাই, থাকা উচিতও হইত না। নূতন সমাজ-জীবনের প্রবাহ নূতন নূতন সত্যকে—নূতন নূতন সমাজাদর্শকে বহন করিয়া আনিয়াছে; সেই নূতন সত্যের বাণী বহন করিয়াই শরৎ-সাহিত্য একদিন রিয়াল্‌ হইয়া উঠিয়াছিল। জীবন-যাত্রার পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গেই আদর্শও বদলায়; সেই আদর্শের যে যুগোচিত পরিবর্তন তাহারই আমরা নাম দিয়াছি রিয়ালিস্ট্‌ শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহের সুর।

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, শরৎচন্দ্র ছিলেন সমাজ-বিদ্রোহী; ইহাকে মিথ্যা ভাষণ না বলিলেও বলিব অসতর্ক ভাষণ। সমাজ-বিদ্রোহী শিল্পী কখনও রিয়ালিস্ট্‌ হইতে পারেন না। বিদ্রোহ আসলে সমাজের সেই অংশটার বিরুদ্ধে, যে অংশ জীবনের পক্ষে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে অথচ জীবনকে তাহার কবলমুক্ত করিতে চাহিতেছে না। শরৎচন্দ্র সমাজকে যথার্থ কোন দিন ভাঙিতে চাহেন নাই; যে নূতন সত্যকে সমাজ-জীবন বহন করিয়া আনিয়াছে—যাহার সন্ধান তাঁহার সূক্ষ্ম তীব্র সংবেদনশীল হৃদয়ের কাছেই ধরা পড়িয়াছে, তখন পর্যন্ত জনসাধারণের নিকটে গ্রাহ্য হইবার মতন রূপ পরিগ্রহ করে নাই—সেই সত্যের উপরে সমাজ-জীবনকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। একটা বৃহৎ জাতির জীবনে প্রবাহের ঘূর্ণ্যাবর্তে কি সত্যের সঞ্চারণ হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোন্‌ সত্যের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা প্রথমে আসিয়া সংবেদনের স্পন্দন তোলে যথার্থ শিল্পিচিত্তে, গণচেতনা হয়ত তখনও উদ্‌বুদ্ধ হয় না, জনগণ অস্পষ্ট অন্তর্বেদনাকে নিজেরাই ততক্ষণে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই অবস্থায় যখন ঘটে একজন যথার্থ শিল্পীর আবির্ভাব, তখন

সেই আবির্ভাব স্বভাবতঃই বহন করে একটা বিদ্রোহের সুর। সেই বিদ্রোহের সুরের ভিতরেই আছে রিয়ালিজ্‌ম্-এর পদধ্বনি।

হালে কিন্তু আবার শরৎচন্দ্রও ঠিক হালে পানি পাইতেছেন না। সমাজ-জীবনের আরও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রিয়ালিজ্‌ম্-ও একটু একটু করিয়া উবিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য হইয়া দেখা দিতেছে তাঁহার রোমান্স্‌ধর্ম এবং আদর্শবাদিতা। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের লেখক-ধর্মের সহিত আমাদের মনোধর্মের যে সায়টা তাহাতেও ক্রমে ভাঁটা পড়িতেছে।

রিয়ালিজ্‌ম্-এর যে ধর্মের কথা পূর্বে আলোচনা করিলাম, তাহাই একটি স্পষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে আমাদের প্রগতিবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে। প্রগতিবাদী কথাটা অবশ্য আমাদের সাহিত্যে অতি শিথিল-প্রযুক্ত, সুতরাং শুধু 'দ্ব্যর্থক' নয় 'বহ্বর্থক'। আমাদের দেশে কথাটার একটা মোটামুটি পারিভাষিক অর্থ আছে; সেই পারিভাষিক অর্থে প্রগতি-সাহিত্য বা প্রগতি-শিল্প অর্থ গণ-সাহিত্য বা গণ-শিল্প। জানি, রেহাই পাইবার উপায় নাই, খরতর প্রশ্নবাণ উদ্যত হইয়া আছে। বাঙলা দেশে গণ-সাহিত্য কথাটার অর্থ কি? ইহা কি গণের জন্য রচিত সাহিত্য, না গণকর্তৃক রচিত সাহিত্য, না গণ-অবলম্বনে রচিত সাহিত্য? এ ক্ষেত্রে তর্কের অবকাশ প্রচুর; কিন্তু সেই পথ অবলম্বন না করিয়া সহজ সিদ্ধান্তের পথ গ্রহণ করিতেছি। সহজ সিদ্ধান্ত মতে গণ-সাহিত্যের সংজ্ঞা আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই, এখানে সাহিত্যিক এবং সাধারণ শিল্পীর মনে জনগণের পরম কল্যাণের একটি জীবনাদর্শ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এই জীবনাদর্শে অটল বিশ্বাস লইয়া সাহিত্য এবং সাধারণ শিল্পের মারফতে জনগণকে এই জীবনাদর্শে

উদ্‌বুদ্ধ করিবার ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই গণ-সাহিত্যিক বা গণ-শিল্পী। এই আদর্শটিকে হয়ত একটু উগ্ররূপে দেখিতে পাইতেছি আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে, সেই জন্য আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, জিনিসটা আর কিছুই নয়, সাহিত্যের শাশ্বত ধর্মের উপরে একটা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উগ্রচেতনার প্রতিক্রিয়া। খাঁটি গণ-সাহিত্যিক বা গণ-শিল্পীর পক্ষে কিন্তু এই আদর্শ শুধু একটি রাজনৈতিক আদর্শ নয়—সমগ্র-জীবনাদর্শ। সাহিত্য বা শিল্পের কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিছক রাজনৈতিক আদর্শ বলিয়া আজিকার দিনে কোন জিনিস হইতে পারে না; রাজনীতি সমগ্র জীবন-নীতিরই একটি বিশেষ দিক্‌ মাত্র।

কিন্তু আদর্শ যাহাই হোক্‌, এ ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যে বা শিল্পে খাঁটি উপাদানের অপ্রাচুর্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার কারণ এই, প্রগতিবাদী লেখক ও শিল্পি-গোষ্ঠীর ভিতরে যে পরম কল্যাণের আদর্শটি প্রচারিত আছে, একটা বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বানের মুখেই যেন আমরা তাহার অনেকখানি কুড়াইয়া পাইয়াছি; সেই বানের জল ঘাটের পুকুরে এবং চারিদিকের খানা-ডোবায় এ পর্যন্ত ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। প্রগতিবাদিগণের এই কল্যাণের পরামাদর্শটি হইল মুখ্যতঃ মার্ক্‌স্‌-প্রদর্শিত আদর্শ; পরে অবশ্য লেনিন্‌ এবং স্ট্যালিন্‌ কর্তৃক ব্যাখ্যাত এবং আচরিত হইয়া তাহা ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। এই যে মার্ক্‌স্‌-পন্থা ইহাকে শুধু মাত্র একটি রাজনৈতিক পন্থা মনে করিলে ভুল হইবে; ইহা একটি বিশিষ্ট জীবন-পন্থা। কিন্তু আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই, রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহাকে হয়ত গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ইহাকে গভীর করিয়া গ্রহণ

করিতে পারি নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রেও ঠিক গ্রহণ করিতে পারিয়াছি বলা যায় না, অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনের একটা ঝোঁক আসিয়াছে। এই যে রাজনৈতিক-বোধ এবং জীবন-বোধের বিরোধ তাহার ফল সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও বেশ সহজবোধ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই সাহিত্য এবং শিল্পের আদর্শ সম্বন্ধে সভা-সমিতিতে আমরা গাল ভরিয়া যাহা বলি, সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাণ ভরিয়া তাহা করি না। 'অর্থাৎ করিয়া' বলিলে বলিতে হয়—আমরা নিজেরা হয়ত মার্ক্স্-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি, 'অন্তর্যামী'কে এখনও দীক্ষিত করিতে পারি নাই।

ফলে, এখন পর্যন্ত মার্ক্স্‌বাদে প্রতিষ্ঠিত রিয়ালিস্টিক্ সাহিত্য বা শিল্প আমাদের দেশে খুব বেশী গড়িয়া ওঠে নাই। কিন্তু অল্প গড়িয়া উঠুক্ আর বেশী গড়িয়া উঠুক্, মার্ক্স্‌বাদে প্রতিষ্ঠিত রিয়ালিজ্‌ম্ কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই মতে সাহিত্য বা সাধারণ শিল্প সৃষ্ট হইবে জীবন লইয়া ; কোন ব্যক্তি-জীবন নহে,—সমাজ-জীবন লইয়া ; কারণ ব্যক্তি-জীবনের সমাজ-নিরপেক্ষ কোন স্ব-তন্ত্র বা স্ব-ধর্ম নাই ; উভয়ে জড়িত একান্ত অঙ্গাঙ্গিরূপে। এই সমাজ-জীবন লইয়া সাহিত্য রচনা করিতে হইলে প্রথমে বুঝিতে হইবে, চারি পাশের এই সমাজ-জীবন কি ভাবে রচিত হইতেছে। শিল্পীর পক্ষে এই 'বোঝা' জিনিসটির অর্থ হইল সহজাত অসীম শ্রদ্ধা ও দরদের ভিতর দিয়া প্রবহমান সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে নিজের সূক্ষ্ম গভীর সংবেদনশীল চিত্তে অনুভব করা। এই সমাজ-জীবনকে নিরন্তর গড়িয়া-পিটিয়া একটি বিশেষ রূপ এবং ধর্ম দান করিতেছে কতগুলি অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই শক্তি সৃষ্ট হয় কতগুলি পারিপার্শ্বিক হেতু-প্রত্যয়ের সমাবেশে, মার্ক্স্-এর মতে

ইহার ভিতরে মুখ্য হইল বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতি। সাহিত্যিক এবং সাধারণ শিল্পীর কাজ শুধুমাত্র কল্পনা-বিলাস নহে; তাঁহাকে দরদ ও শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিতে এবং বুঝিতে হইবে, একটি সমাজ-জীবনের আবর্তের ভিতরে প্রাচীন ধারার কি কি শক্তি কাজ করিতেছে, সেই প্রাচীন ধারার উপরে বিভিন্ন পরিবর্তমান পারিপার্শ্বিকতার সমাবেশে নিরন্তর কি নব নব শক্তির উৎসারণ হইতেছে, এবং ইতিহাস-উৎসারিত এই সকল শক্তির দুর্বার প্রবাহ সমাজ-জীবনকে কোন্ পরিণতির দিকে টানিয়া লইতেছে; আর এই সঙ্গেই মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বজীবনের এতদিনকার ইতিহাসের আবর্তন এবং তজ্জনিত সমাজ-বিবর্তন কোন্ মঙ্গলময় আদর্শের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। নব নব সৃষ্ট সমাজশক্তিগুলির ক্রিয়াভিমুখিতাকে এই সর্বজনীন মঙ্গলের যে আদর্শ তাহারই দিকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া একাভিমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। এই কাজ সমাজের কোন বিশেষ স্তরের বা বিশেষ বিভাগীয় লোকের নয়; এই কাজ মাঠের চাষীর, কলের মজুরের, পদস্থ রাষ্ট্রসেবকের—যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গীনধারী প্রতিটি সৈন্যের এবং তাহারই সঙ্গে ঠিক সমভাবে লেখনীধারী প্রতিটি লেখকের—তূলিকাধারী প্রতিটি শিল্পীর। সুতরাং সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে রিয়ালিজ্‌ম্-এর তাৎপর্য হইল, সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রিয়মাণ সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির যথার্থ পরিচয় চিত্ত-সংবেদনের ভিতর দিয়া গ্রহণ করা এবং সমস্ত প্রতিভার প্রয়োগে তাহাদিগকে সর্বজনীন পরমাদর্শের অভিমুখী করিয়া তোলা। ইহাই চরম যুগানুবর্তিতা—ইহাই রিয়ালিজ্‌ম্-এর পরম আদর্শ।

এইখানেই একটি নূতন সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। দেখা

যাইতেছে, একটা চরম 'অনুবর্তিতা'ই তাহা হইলে রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর মূল কথা ; আর প্রগতিবাদীদের মতে এই রিয়ালিজ্‌ম্‌-ই হইল সকল শিল্প এবং সাহিত্যের প্রাণ। তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত সমাজ-জীবন-প্রবাহের একটা চরম অনুবর্তিতাই গিয়া দাঁড়ায় শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণবস্তুরূপে। কিন্তু এত দিন আমরা জানিতাম, মুক্তি—স্বাধীনতাই শিল্পের প্রাণ। আমরা জানিতাম, শিল্প ও সাহিত্য শিল্পী ও লেখকের স্বচ্ছন্দ আনন্দ-লীলারই অবাধ রূপায়ণ ; শিল্পের কারখানায় শিল্পী অসঙ্গ ও একক।

মার্ক্‌স্‌-পন্থিগণের মতে শিল্পের ক্ষেত্রে এই অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের ধারণাটাই একান্ত স্ববিরোধী। এই স্ববিরোধের অর্থ এই নয় যে, এই স্ববিরোধের ফলে ইতিহাসের ক্ষেত্রেই ইহা কোনদিন সম্ভব হইয়া উঠে নাই ; ইতিহাসের ক্ষেত্রে এতদিন এই অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের সম্ভাবনা এবং সংঘটনাই বেশী দেখা গিয়াছে ; কিন্তু যুগে যুগে তাহাকে আমরা যতই রঙীন জমকালো করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি, সেখানে যে শিল্পের আদর্শচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই জাতীয় সাহিত্য এবং শিল্প যতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহাকে নিপুণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, সেই সার্থকতার মূলে রহিয়াছে সাহিত্যিক বা শিল্পীর নিজের অজ্ঞাতেই সহজ শিল্পধর্মের প্রবর্তনাতেই যুগ-জীবনের প্রতি অনেকখানি অনুবর্তিতা ; সেই কারণেই সে হইয়াছে সেই যুগের পক্ষে সহজ ও সানন্দ-গ্রাহ্য।

প্রগতিবাদিগণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই মুক্তি বা স্বাধীনতার পরিপন্থী নহেন ; তাঁহাদের পরিপন্থিতা এই মুক্তি বা স্বাধীনতার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে। তাঁহাদের মতে আমাদের শিল্পবোধ বা শিল্পশক্তিই

একটা গূঢ় সামাজিক বোধ-প্রসূত। শিল্পের মূল কথা প্রকাশ। সমাজবোধ ব্যতীত কখনও প্রকাশের তাগিদ আসে না। আদিযুগ হইতে বিভিন্ন শিল্পের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলেই এই সত্যটি ধরা পড়িবে। শিল্পায়ন প্রক্রিয়াটিই মূলে সমাজধর্ম-জাত। যেখানে আমরা একাকী সেইখানেই আমরা অসামাজিক; বহুর যোগে শিল্পজগতেই আমরা হইয়া উঠি যথার্থ সামাজিক। আজ আত্ম-প্রকাশের সকল তাৎপর্যকে যেখানে আত্ম-রতির ভিতরেই আমরা নিবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছি সেখানে সে পরিচয় দিতেছে আমাদের বিকাশের নয়, বিকারের; কারণ এই আত্ম-রতির বাসনা এবং তৎ-প্রণোদিত অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের মহিমা-কীর্তন আমাদিগকে আমাদের মূল অর্থ—আমাদের সমাজ-সত্তা হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিতেছে। তাহা হইলে শিল্পের ক্ষেত্রে আসল মুক্তি কি? সমাজ-প্রবাহের অনুবর্তিতাই বন্ধন নয়, অন্ধ অনুবর্তিতাই হইল বন্ধন। যাঁহারা সমাজ-জীবনকে ঠিক জানেন না—তাহার গতি-প্রকৃতির সহিত যাঁহাদের কোনও পরিচয়ও নাই, অন্তরের যোগও নাই,—অথচ দুর্বার সমাজ-স্রোত অন্ধ নিয়তির মতন তাঁহাদিগকে সকল সচেতন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেগে টানিয়া লইতেছে—অসহায় ক্রীড়নকের মতন পরিবর্তনের প্রতিটি বাত্যাবিক্ষোভের দ্বারা দোলাইয়া মারিতেছে—শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁহারাই যথার্থ বদ্ধ—পরাধীন। মুক্তি সমাজ-জীবনের প্রতি সচেতন অনুবর্তিতায়। সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি-লীলার প্রতিটি স্পন্দনকে যে নিজের অন্তরে ধারণ করিতে পারিয়াছে এবং সেই সঙ্গে অনুভব করিতে পারিয়াছে নিজের জীবন-ধারার সহিত সেই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অখণ্ড যোগ—সে বুঝিতে পারিয়াছে এই ঘোলাটে জটিল প্রবাহের ভিতর কোথায়

তাহার স্থান—কি তাহার শক্তি—সেই শক্তি লইয়া কি তাহার করণীয়। সমস্ত জিনিস জানিয়া-বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সানন্দে শিল্প-সৃষ্টির ভিতর দিয়াই বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে যে যোগ তাহাই হইল শিল্পীর স্বচ্ছন্দ-বিহার—ইহাই স্বাধীনতা—ইহাই মুক্তি। শিল্পীর সমগ্র জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় সত্য—ইহাই রিয়াল্—ইহারই অনুবর্ত্তনায় রচিত যে শিল্প তাহাই বহন করে রিয়ালিজ্‌ম্।

রিয়ালিজ্‌ম্ কথাটিকে নানা দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। কিছু কিছু মতবাদকে অনেকে হয়ত নিছক 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া বর্জনের সদুপদেশ দিবেন। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রের সকল সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করিয়াও সকল আলোচনার ভিতরে একটা জিনিস প্রধান হইয়া উঠিতেছে, তাহা এই যে, রিয়ালিজ্‌ম্-এর গোড়ার কথা যুগ-সত্য। ইংরেজি রিয়াল্ কথাটার বাঙলা 'বাস্তব' অর্থ অতিমাত্রায় স্থূল, 'রিয়াল্' কথাটার আসল অর্থ 'সত্য'। যাহা সমগ্র যুগ-জীবনের সহিত গভীর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বৃহত্তর যুগ-মানসে 'সত্য' রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই রিয়াল্,—সে নিখুঁত বর্ণনাই হোক্—রঙীন কল্পনাই হোক্—বা গভীর আদর্শনিষ্ঠাই হোক্। পাশ্চাত্ত্য জগতে আজকাল এই অর্থে আর একটি কথার ব্যবহার দেখিতেছি, তাহা 'সিগ্‌নিফিক্যান্ট্' (significant)। সব দিক হইতে যে শিল্প-রচনা যুগ-জীবনের পক্ষে সার্থক তাহাই রিয়ালিস্টিক্। রিয়ালিজ্‌ম্-এর তাই আমি অর্থ করিতে চাই—যুগ-সত্যবাদ।

কিন্তু এই 'যুগ-সত্যবাদ' কথাটা আসলে যাহাই হোক্ শুনিতে কেমন ছোট লাগে; সুতরাং কথাটায় হয়ত অনেকেরই মন উঠিবে না; সংশোধন প্রস্তাব আসিবে, 'রিয়ালিজ্‌ম্' 'যুগ-সত্যবাদ' নয়—ওটা 'জীবন-সত্যবাদ'। কথাটাকে আমি ঠিক ধরিতে পারিনা।

জীবন-সত্যবাদ কথাটাকে আমরা যদি ইহার অধুনা-প্রচলিত অর্থে—অর্থাৎ শিল্পীর দৃষ্টি জীবনের সকল আশপাশ হইতে সংহৃত হইয়া জীবনের অতিবাস্তব রূঢ় সমস্যাগুলির দিকেই কেন্দ্রীভূত হইতেছে—এই সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিতে চাই তবে তাহার প্রতিষ্ঠা যে কি করিয়া যুগ-সত্যেরই উপরে, পূর্বে আমি সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আর যদি কোনও বিশেষ অর্থে গ্রহণ না করিয়া কথাটিকে তাহার সাধারণ অর্থে গ্রহণ করি তবে আরও ধাঁধার ভিতরে পড়িয়া যাইতে হয়। জীবন-সত্যেই তাঁহার শিল্পের প্রতিষ্ঠা, এ দাবী জানাইবেন সব শিল্পী—সব যুগেই। কাহার দাবী সত্য—কাহার দাবী মিথ্যা—কে বিচার করিবে? আমরা এ যুগের মানুষ যখন সে বিচার করিতে বসি তখন যুগের পক্ষপাতিত্ব লইয়াই ত' বিচার করিতে বসি। জীবনের সত্য কি তাহা কে বলিবে? তাহা একটি বিশেষ কালের শিল্পি-বিশেষের সৃষ্টিতেই আসিয়া ধরা পড়িয়াছে সে কথাই বা কি করিয়া গ্রহণ করিব? জীবনে যে মহাকাল জুড়িয়া, আর এই মহাকালের ক্রমাবর্তনের মধ্যে জীবনের সত্য ত' শুধু পলে পলে 'হইয়া' উঠিতেছে। জীবনটা শুধু অনন্ত 'হওয়া'র পথে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর তাহার সত্যটা আসিয়া সমগ্রভাবে বিশেষ কোনও শিল্পীর ধ্যানে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এ কথাই বা কি করিয়া গ্রহণ করিব? মহাকালের খণ্ড খণ্ড অংশে জীবন-সত্যের তাই অনন্ত ক্রমাভিব্যক্তি। প্রতি যুগ বহন করিয়া আনে সত্যের এই ক্রমাভি-ব্যক্তিকে; যুগাবর্তে অভিব্যক্ত সেই সত্যটিকেই ত' আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে বড় করিয়া নাম দিতে গিয়া যে রিয়ালিজ্‌ম্‌কে জীবন-সত্যবাদ বলিয়া অভিহিত করি তাহা হয়ত' যুগ-সত্যেরই মহিমান্বিত নাম-রূপ।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধ ও সাম্প্রতিক শিল্পবোধের দ্বন্দ্ব

সাহিত্য বা সাধারণ শিল্প সম্বন্ধে আমরা যখন আলোচনা করিতে বসি, তখন একটা কথা আমরা অনেক সময়ে খুব বড়-গলায়ই বলিয়া থাকি, তাহা হইল এই যে, 'সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা হয়, ইহা হয় না, বা ইহা হওয়া উচিত, ইহা অনুচিত' ইত্যাদি। ইহার ভিতরে লক্ষণীয় বিষয় এই, সাহিত্যালোচনায় বা শিল্পালোচনায় আমরা সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের একটা স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র 'ক্ষেত্র' নির্দিষ্ট করিয়া লই এবং আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, এই সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্র আমাদের জীবনের ক্ষেত্র হইতে একেবারে না হইলেও অনেকখানি পৃথক্। জীবনের ক্ষেত্র এবং শিল্পের ক্ষেত্রের এই পার্থক্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই কীর্তিত হইয়া আসিতেছে; এ-কথা যে বলা হয় শিল্পীর আত্মরক্ষার তাগিদেই এমন নয়, ইহার ভিতরে হয়ত আছে শিল্পিমনের একটি প্রচ্ছন্ন আত্মতোষণ, যাহাকে ঠিক অবিমিশ্র নিন্দার্হ বলিয়াও অভিহিত করা চলে না।

কথাটি বহু-প্রচলিত হইলেও প্রমাদ-গর্ভ; সুতরাং ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে অবহিত হইবার প্রয়োজন আছে। জীবনের ক্ষেত্র অপেক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রকে আমরা যখন পৃথক্ বলি, তখন 'জীবনের ক্ষেত্র' বলিতে আমরা কি বুঝি? সেখানে জীবনের ক্ষেত্র বলিতে যদি আমাদের দৈনন্দিন একান্ত ব্যবহারিক বা লৌকিক জীবনের কথাই আমরা মনে করি তবে সমস্যা অনেক সহজ হইয়া যায়;

কারণ শিল্পিজীবন এবং শিল্প-ধর্ম লৌকিক জীবন এবং লৌকিক ধর্ম হইতে যে অনেকখানি পৃথক্ এ বিষয়ে মতদ্বৈধ কম। কিন্তু আসলে আমাদের এইখানেই থামা উচিত হইলেও এইখানেই আমরা থামি না; স্পষ্ট ভাবে হোক বা অস্পষ্ট ভাবে হোক আমাদের শিল্পবোধকে আমাদের অন্যান্য সকল বোধ হইতে স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ করিয়া একটা বিশেষ শিল্প-দর্শন দাঁড় করাইবার ঝোঁক আমাদের আছে। বিপদাশঙ্কা এই পথে।

শিল্প-দর্শন যদি সমগ্র জীবন-দর্শন হইতে উদ্ভূত না হয়, তবে সেখানে শিল্প-দর্শনের শেষ পরিণতির আশঙ্কা একটা বিশুদ্ধ আকৃতিগত নিয়মতান্ত্রিকতায় (formalism)। প্রত্যেক যুগেই দেখা যায়, শিল্প প্রথমে জীবনের সঙ্গেই গভীরভাবে যুক্ত থাকে; জীবন হইতে একটু একটু করিয়া সে যত দূরে সরিতে থাকে ততই তাহার ভিতরে আসিতে থাকে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রাধান্য; এই নিয়মতান্ত্রিকতার প্রাধান্যই শিল্পকে শেষ পর্যন্ত অর্থহীন করিয়া তোলে। ফলে, শিল্পের আদর্শ বা ধর্ম লইয়া আমাদের যে মতানৈক্য তাহা বহু সময়েই দেখা দেয় একটা বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক তর্কের রূপে। এই জাতীয় নৈয়ায়িক তর্কের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে যত ইচ্ছা শাণিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা সত্য লাভের আশা খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না।

যথার্থ কোন শিল্পীর পক্ষে তাঁহার জীবন-দর্শন এবং শিল্প-দর্শনের ভিতরে কোনও পার্থক্য বা সীমারেখা থাকিতে পারে না; উভয়ে এক এবং অভিন্ন; জীবনের কতকগুলি গভীর অনুভূতি ও অনুভূতিলব্ধ বিশ্বাসই এই সকল 'দর্শনে'র গোড়ার কথা। এ সত্যটি সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে রবীন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেই। রবীন্দ্রনাথের

সকল কাব্য-কবিতা, নাটক-উপন্যাস, রচনা-প্রবন্ধ প্রভৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায়, সাধারণ শিল্প—বিশেষ করিয়া সাহিত্য—সম্বন্ধে তাঁহার কতগুলি বিশেষ বিশ্বাস এবং আদর্শ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সকল লেখার ভিতর দিয়া যেমন এই ভাবে একটি শিল্প-দর্শন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই তাঁহার সকল লেখার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে একটি জীবন-দর্শন। এই কবি রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে এক এবং অভিন্ন বলিয়া রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবন-দর্শনেরই অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে; অথবা বলা যাইতে পারে, উভয়েরই উৎস-মূল এক এবং অভিন্ন।

বর্তমান কালে রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শের সহিত আমাদের অনেকেরই বনিবনা হইতেছে না। যাঁহারা 'রবীন্দ্রোত্তর'-যুগচিহ্নিত হইবার দুর্নিবার লালসায় রবীন্দ্রোত্তর হইবার আপ্রাণ কসরৎ করেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও বলিতে হয়, মতের পার্থক্য অনেকখানি ঘটিয়াছে। এই মতের পার্থক্যটা বুঝাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে রোমান্টিক্, পলাতক, সমাজচ্যুত, কল্পনাবিলাসী, বুর্জোয়া প্রভৃতি আখ্যাগুলিকে যেভাবে কটুঝাঁঝ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগের চেষ্টা হয় তাহা যে খুব বাখ্যাসহ তাহা নয়; কিন্তু ঝাঁঝের কথা বাদ দিলে কাজের কথাও কিছু-কিছু আসিয়া পড়ে, তাহাই এখানে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শের সহিত বর্তমান কালের শিল্পাদর্শের যে পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহার পরিমাণ, প্রকৃতি এবং কারণ সম্বন্ধে ভাল করিয়া খতাইয়া দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে; কারণ, আমার মতে বাঙালীর সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই জিনিসটির একটি বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শুধু মাত্র নিয়মতান্ত্রিক তর্ক বা প্রতিবাদে কোন লাভ হইবে না। এই

শিল্পাদর্শের পার্থক্যের পশ্চাতে আছে একটা বিরাট পরিবর্তন ; সেই পরিবর্তনটিকে আগে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

বর্তমান কালে এই রবীন্দ্র-শিল্পাদর্শ-বিরোধী শিল্পী এবং সাহিত্যিকগণ কাহারা ? সংক্ষেপে ইঁহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে প্রগতিবাদী বলিয়া। অন্যত্রও বলা হইয়াছে, আমাদের সাহিত্য ও সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রগতিবাদের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে ; অর্থটিকে সম্পূর্ণ পারিভাষিক না বলিয়া একটি যোগরূঢ় অর্থ বলা যাইতে পারে। এই প্রগতিবাদী শিল্পী এবং সাহিত্যিকগণ হইলেন মোটামুটিভাবে মার্ক্স্‌পন্থী শিল্পী এবং লেখকগণ। রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শনের সহিত এই প্রগতিবাদী শিল্পী ও লেখকগণের শিল্প-দর্শনের যে পার্থক্য, আসলে তাহা দুইটি পরস্পর-বিরোধী জীবন-দর্শনেরই মৌলিক পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শন যেমন প্রতিষ্ঠিত তাঁহার জীবন-দর্শনের উপরে, প্রগতিবাদী শিল্প-দর্শন তেমনই প্রতিষ্ঠিত মার্ক্স্‌দর্শনের উপরে। রবীন্দ্র-শিল্প-দর্শনও আসলে তাঁহার জীবন-দর্শনেরই প্রয়োগ মাত্র ; প্রগতিবাদী শিল্প-দর্শনও তেমনই মার্ক্স্‌দর্শনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ মাত্র। মৌলিক পার্থক্য যাহা তাহা সবই জীবন-দর্শনের, সেই কথাটাই আমি রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শনের কতকগুলি প্রধান ধারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

পূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্র-শিল্প-দর্শনের সহিত যে আধুনিক শিল্প-দর্শনের বিরোধ, আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহার একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। সে বিশেষত্বটি এই—আমার মনে হয় আমাদের ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে একটি বিশেষ ধারা অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্কিম গতিতে আবর্তিত হইয়া

আসিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেই ধারার শেষ মনীষী এবং কবি। অবশ্য একেবারে শেষ কি না এ কথা জোর করিয়া বলা দুঃসাহসের কাজ; অনেকেরই হয়ত এমন বিশ্বাস আছে, আমরা আমাদের চারি দিকে আজকাল যে সব বিরোধী মতের প্রচার ও প্রসার দেখিতে পাইতেছি, উহা একটা সাময়িক বিপর্যয়েরই ফল, এই বিপর্যয়কে এড়াইয়া উঠিয়া আমরা আবার প্রকৃতিস্থ এবং আত্মস্থ হইতে পারিব। ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতি এবং পরিণতি সম্বন্ধে বিতর্কে লাভ নাই। বাস্তবে যাহা দেখিতে পাইতেছি তাহা এই, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় এই ধারাটির ধারক আর কাহাকেও তেমন দেখা যাইতেছে না,—বিরোধের আঘাতটাকেই প্রবল মনে হইতেছে। এই যে ভারতীয় ধারার কথা উল্লেখ করিতেছি, তাহার বৈশিষ্ট্য কি? ইহার বৈশিষ্ট্য হইল অধ্যাত্মবাদ। এই অধ্যাত্মবাদই রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের মূলে; আমার বিশ্বাস, এই অধ্যাত্মবাদই রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শনেরও মূলে। মার্ক্স্‌বাদের আরম্ভই আবার এই অধ্যাত্মবাদের বিরোধিতায়, তাহার প্রতিষ্ঠা-ভূমি জড়বাদে। মার্ক্স্‌পন্থীয় শিল্প-দর্শনের মূলেও তাই রহিয়াছে একটা আপোষহীন জড়বাদ। রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শ এবং আধুনিক শিল্পাদর্শের ভিতরে যেখানে যেটুকু বিরোধ, ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, সকল বিরোধের মূলে রহিয়াছে ঐ অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের বিরোধ। অধ্যাত্মবাদী বলিয়া রবীন্দ্রনাথের মনকে আমরা কিছুতেই প্রগতিবিরোধী 'সনাতনী' বলিতে পারি না। মার্ক্স্‌বাদের বহু সত্যকে তিনি কোন 'বাদে'র কোঠায় না ফেলিয়া আপনা হইতেই শ্রদ্ধা করিয়াছেন এবং নিজের মতন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান রাশিয়ার বহু ব্যবস্থার

প্রতি তিনি কিরূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তাঁহার 'রাশিয়ার চিঠি'তে তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু সমস্ত শ্রদ্ধার পশ্চাতে এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড অমিল তাঁহার মনে কাঁটার মতন বিঁধিত এবং তাহাই তাঁহার চিত্তকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এই সংশয়ের একটি সুন্দর ইঙ্গিত রহিয়াছে তাঁহার 'কালের যাত্রা'র অন্তর্গত 'রথের রশি' কাব্য-নাটিকায়। মহাকালের রথের রশিটা অনড় হইয়া পড়িয়া আছে পথে; সে আজ আর পুরোহিতের মন্ত্রতন্ত্রে নড়ে না, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-প্রতাপে নড়ে না; ভক্তিমতী মেয়েরা আসিয়া সব দড়ি-নারায়ণকে গলবস্ত্র হইয়া গড় করিল, তাহার ভোগ চড়াইল, তাহাতে ঘি ঢালিল, গঙ্গাজল ঢালিল, পঞ্চগব্য পঞ্চ-প্রদীপ কিছুই বাকি রহিল না; শেষ পর্যন্ত রাজ্যের রাজা আসিলেন তাঁহার সকল সৈন্য-সামন্ত লইয়া, তাহাতেও কোন ফল ফলিল না। পরে আসিল সব শ্রমজীবী শূদ্রের দল, রথের রশি নড়িয়া উঠিল তাহাদের সবল বাহুর টানে। কিন্তু এই নব-জাগ্রত শূদ্রশক্তিকে কবি এখানে যতই অভ্যর্থনা জানান, ইহার সম্বন্ধে একটা প্রবল শঙ্কা তাঁহার মনে ছিল। পুরোহিত যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে?

তাহার জবাবে কবি বলিয়াছিলেন,—

পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই,
রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙ্গল চরকা তাঁতের।

তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

এইখানেই কবি রবীন্দ্রনাথেরও একটা মৌলিক সংশয়। নবজাগ্রত শ্রমিকশক্তি যদি অধ্যাত্ম-বিশ্বাসকে একেবারে হারাইয়া ফেলে তবে সেই বলরামের চেলাদের আত্মঘাতী মদমত্ততায় কল্যাণের অপমৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। আমার বিশ্বাস, উপরের কথাটির ভিতরে ধ্বনিত হইয়াছে কবি রবীন্দ্রনাথের একটি মূল সুর। এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, অথবা বলা যায়, এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাস কি করিয়া রবীন্দ্রনাথের সকল শিল্প-বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি হইয়া রহিয়াছে, কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহারই আলোচনা করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধের ভিতরে 'অন্তর্যামী' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। 'চিত্রা' কাব্যের 'অন্তর্যামী' কবিতাটির ভিতরে এই অন্তর্যামীর পরিচয় প্রকৃষ্ট হইয়া উঠিলেও বিভিন্ন যুগের কাব্যগ্রন্থে এই অন্তর্যামীর পরিচয় নানা ভাবে ছড়াইয়া আছে। কবির এই 'অন্তর্যামী' কে? 'অন্তর্যামী' কবিতাটির ভিতরে এই অন্তর্যামীর পরিচয় তিনটি স্তরে বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রথম স্তরের অন্তর্যামী রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের অন্তর্যামী; দ্বিতীয় স্তরে দেখিলাম, যিনি ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী তিনিই আরও গভীর এবং ব্যাপক রূপ লইয়া দেখা দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পুরুষীয় সত্তার অন্তর্যামিরূপে। তৃতীয় স্তরে দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিপুরুষের যিনি অন্তর্যামী তিনিই দেখা দিলেন বিশ্বজীবনের অন্তর্নিহিত সত্যরূপে।

প্রথম স্তরে কবির যে অন্তর্যামীর সন্ধান পাইলাম তাহাতে

দেখিতে পাইলাম, কবি তাঁহার সকল শিল্পসৃষ্টির ভিতরেই এই একটা সত্য অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহার কোন সৃষ্টিই তাঁহার ভাসমান সচেতন 'আমি'টির দ্বারা সৃষ্ট নয়; নিজের লৌকিক ব্যক্তি-সত্তার পশ্চাতে তিনি সর্বদা অনুভব করিয়াছেন চেতনলোকের অন্তরালবর্তী আর একটি অসীম কৌতুকময়ী গভীর সত্তাকে, যাহার হাতে কবি ক্রীড়নক বা যন্ত্রের মত পরিচালিত বা ধ্বনিত হইয়াছেন। এই অনুভূতিটির ভিতরে রবীন্দ্রনাথের কোন বৈশিষ্ট্য নাই; জগতের সকল যুগের সকল বড় কবি বা শিল্পীই এই সত্যটিকে অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহাদের যাহা কিছু সৃষ্টি তাহা তাঁহাদের লৌকিক 'আমি'র সচেতন সৃষ্টি নয়; শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা শুধু নয়, শিল্পসৃষ্টির প্রকাশ-ক্রিয়াও সঙ্ঘটিত হয় শিল্পীর অচেতনে; অচেতনে সমাহিত কবি বা শিল্পীর এই বৃহত্তর সত্তা ও শক্তির নিকটে অনেক কবি বা শিল্পীই আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন।

আজকালকার দিনে মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে এই অন্তর্যামীর ব্যাখ্যা অতি সহজ। আধুনিক মনোবিকলন শুধু আমাদের শিল্প-সৃষ্টির পশ্চাতে কেন, সকল সৃষ্টির পশ্চাতেই এক অদৃশ্য শক্তি বা অন্তর্যামীর আবিষ্কার করিয়াছে। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় বাসনা-লোকের ভিতরেই এই অন্তর্যামীর অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই অন্তর্যামীতে যে বিশ্বাস, এখানে রবীন্দ্র-নাথের সহিত মার্ক্সপন্থিগণেরও সাধারণ ঐক্যমত রহিয়াছে। কিন্তু মতান্তর হইতেছে এই অন্তর্যামীর স্বরূপ লইয়া। মনোবিকলনবাদিগণ এই অন্তর্যামীকে অবচেতন এবং অতিচেতনে বিরাজিত আমাদের চেতনের নিয়ামক দ্বৈতসত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। মার্ক্সপন্থিগণ

ইহাকে আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; তাঁহারা বলিবেন, আমাদের ব্যক্তি-পুরুষের অন্তরালবর্তী ব্যক্তি-পুরুষের নিয়ামক এই গভীর সত্তা হইল আমাদের সমাজ-সত্তা। এই বৃহৎ সমাজ-সত্তার ভিতরে শুধু একটি ব্যক্তির মগ্নচৈতন্য বা অতিচৈতন্য লুকাইয়া নাই, —ইহার ভিতরে লুকাইয়া থাকে একটি বৃহৎ জাতির সকল মগ্নচৈতন্য, অতিচৈতন্য, একটি জাতির বাসনা-সংস্কার—ঐতিহ্য-সংস্কৃতি যাহা কিছু সব। একটি ব্যক্তিমনের অন্তরালে যেমন বহু দিক হইতে আসিয়া বহু অদৃশ্য শক্তি কাজ করিতে থাকে, একটি সমাজ-জীবনের অন্তস্তলেও ঠিক সেইরূপ পুরাতন এবং নূতন বহুবিধ শক্তি কাজ করিতে থাকে। এই বিভিন্ন শক্তির সমবায়ে যে একটি বৃহৎ মূল-শক্তি গড়িয়া ওঠে, তাহাই হয় সেই সমাজ-জীবনের নিয়ামক। ব্যক্তি-জীবন এই বৃহৎ সমাজ-জীবনের হাতে অনেকখানি ক্রীড়নক বা যন্ত্রের মত চালিত হয়। শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রে প্রতিফলিত হয় এই বৃহৎ সমাজ-সত্তা। এ দিক হইতে তাই প্রতিভার লক্ষণ করা যাইতে পারে—ব্যক্তি-জীবনের কেন্দ্রে সমাজ-সত্তার অবাধিত এবং সুষ্ঠু প্রতিফলন-যোগ্যতা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টি তাঁহার নিজের কিছুই নয়; তাঁহার গর্ব এই যে, নিজেকে এমনভাবে সর্বদার জন্য প্রস্তুত রাখিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার কৌতুকময়ী অন্তর্যামী নিজের স্বচ্ছন্দ লীলায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-কেন্দ্রের ভিতর দিয়া অবাধিত প্রকাশলাভ করিতে পারিয়াছে। পুরাতন এবং নবীন বহু শক্তির সমবায়ে সমাজ-জীবনের ভিতরেও আসে এই জাতীয় একটা বিচিত্র এবং স্বচ্ছন্দ প্রকাশ-লীলার আবেগ। সেই আবেগই সমাজ-জীবন হইতে কেন্দ্রীভূত হয় একটি ব্যক্তি-জীবনে; তাহাতেই—

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।
যে-কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে-কথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

ব্যক্তি-সত্তার ভিতর দিয়া এই যে সমাজ-সত্তার অবাধিত প্রকাশ ইহাই শিল্পের স্বতঃস্ফূর্তত্বের তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথ অন্তর্যামীর পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন-জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত ;
তুমি সে-ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।

এই 'নবীন প্রতিমা' বিশ্বজনের বস্তু। যাহা ছিল 'আপনার কথা' এবং 'ঘরের কাহিনী' তাহাই যখন শিল্পরূপ ধারণ করিল, তখন তাহা বিশ্বজনের কথা। মার্ক্স্‌পন্থিগণও তাহাই বলিবেন,—"That which comes from the pen of the writer ceases to be his private possession the moment it is published.

The ideas and views put forward in his works no longer depend on his will, but are completely determined by the objective conditions and the inter-relations of classes." (Lenin on Art and Literature, ১৪৪ পৃঃ)। যাহা লেখকের লেখনী-মুখে বাহির হইয়া আসে তাহা প্রকাশিত হইবামাত্র আর লেখকের নিজস্ব বস্তু থাকে না। তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশিত সব চিন্তা ও মত আর তাঁহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় কতকগুলি বাস্তব হেতু-প্রত্যয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের দ্বারা। মোটের উপর দেখিতেছি, এই অন্তর্যামীর ক্রমাভিব্যক্তি তাহা হইলে শিল্প-চেতনার অন্তর্নিহিত একটা দ্বৈতবোধের ভিতর দিয়া; এই দ্বৈতবোধের এক দিকে রহিয়াছে ব্যক্তি—অপর দিকে রহিয়াছে বৃহৎ সমাজ। বিচিত্র শক্তিগর্ভ এই সমাজ-সত্তাই শিল্পীর অন্তর্যামিরূপে তাঁহার ব্যক্তিসত্তার চারিপাশে একটি বৃহত্তর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া শিল্পীকে ঘিরিয়া থাকে।

মার্ক্স্‌বাদিগণ একান্তভাবেই অনাধ্যাত্মবাদী; তাঁহাদের নিকটে তাই পরম সত্য হইয়া উঠিয়াছে মনুষ্য-সমাজ; শিল্পবোধের সকল উৎসারণ এবং প্রসারণ তাই এই চরম লক্ষ্য মনুষ্য-সমাজকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহজাত অধ্যাত্মবোধ এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে অন্য দিকে অনেক দূরে টানিয়া লইয়াছে। তাঁহার কাব্য-জীবনে যে অনন্ত রহস্যময়ী অদৃশ্য শক্তিকে তিনি বারবার গভীর করিয়া অনুভব করিয়াছেন সে যে মনুষ্য-সমাজের অন্তর্নিহিত কতকগুলি ঐতিহাসিক আবর্তনে সৃষ্ট জড় শক্তিবিশেষ—সেই শক্তির প্রধান উৎস যে মানুষের উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং তজ্জনিত শ্রেণী-সংগ্রাম, উপনিষদের সুরে সুর-বাঁধা রবীন্দ্রনাথ এ-কথা কিছুতেই শ্রদ্ধেয় বলিয়া গ্রহণ

করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে যে পূর্বে এ জাতীয় কথার উদয় হইয়াছিল, এবং পরে তিনি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া সেদিক হইতে মন ফিরাইয়া লইয়াছিলেন তাহা নহে, সহজাত বিশ্বাসবলেই তাঁহার মন চলিয়াছে অন্য পথে। তাই দেখিতে পাই, 'অন্তর্যামী' কবিতাটির দ্বিতীয় স্তরে তিনি এই একটি রহস্যময়ী অদৃশ্য-শক্তিকে তাঁহার সমগ্র জীবনের সমগ্র কর্মের পশ্চাতেই অনুভব করিলেন। এই অদৃশ্য শক্তি শুধু চৈত্তিক সত্যরূপে শুধু তাঁহার কাব্যজীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই দেখা দিল না, দেখা দিল তাঁহার সমগ্র জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে; সুতরাং এই কাব্যের অন্তর্যামী অতি সহজভাবেই তাঁহার জীবন-দেবতার সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আর এই যে ব্যক্তি-জীবন সে ত বিশ্ব-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নয়; সুতরাং এই অনন্ত-রহস্যময়ী শক্তি শুধু কাব্য-জীবনকে নহে, শুধু ব্যক্তি-জীবনকে নহে, সমগ্র বিশ্ব-জীবনেরই অন্তরালে অবস্থান করিয়া বিশ্ব-জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; ইহা বিশ্বের অন্তর্যামী। এই বিশ্বের অন্তর্যামী রবীন্দ্রনাথের নিকটে একটি গভীর অধ্যাত্ম সত্য। তাই দেখিতে পাই, অন্তর্যামী কবিতার শেষ অংশে কবি যেখানে অন্তর্যামীর বর্ণনা করিয়াছেন—

> শূন্য গগন নীল নির্মল,
> নাহি রবিশশী গ্রহমণ্ডল,
> না বহে পবন, নাই কোলাহল,
> বাজিছে নীরব বীণা।
> অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
> কিরণ-বসন অঙ্গে জড়ায়ে
> চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
> ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।

গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তল-ভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।

তখন এই 'অন্তর্যামী'র স্বরূপ বুঝিতে আর কোন কষ্ট হয় না। ইহাকে বেশ মিলাইয়া লইতে পারি উপনিষদের সেই 'অন্তর্যামী'র সহিত, যাঁহার সম্বন্ধে অনেক বলার পরে সর্বশেষে বলা হইয়াছে—"যঃ সর্বতত্ত্বে তিষ্ঠন্‌ সর্বতত্ত্বস্যান্তরঃ, যং সর্বতত্ত্বং ন বেদ, যস্য সর্বতত্ত্বং শরীরং, যঃ সর্বতত্ত্বং যময়তি স আত্মা অন্তর্যামী।" যিনি সর্বতত্ত্বে বর্তমান থাকিয়া সর্বতত্ত্বের অন্তরস্বরূপ, যাঁহাকে সর্বতত্ত্ব জানে না, সর্বতত্ত্ব যাঁহার শরীর, যিনি সর্বতত্ত্বের নিয়ামক সেই আত্মাই অন্তর্যামী। এই ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধের ভিতরকার অন্তর্যামীর ধারণা।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি বিশেষ কাব্য-ভাবধারা লইয়া আলোচনা করা যাক্‌। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা রহিয়াছে যেখানে তিনি নানা ভাবে নিজের ব্যক্তি-সত্তার সঙ্কীর্ণ পরিধিকে কেবলই অতিক্রম করিয়া নিরন্তর আত্ম-প্রসারের ভিতরে আনন্দের সন্ধান করিয়াছেন। কবির এই মনোভাবটির সুষ্ঠু প্রকাশ দেখা যায় বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার একটা নিরন্তর তাদাত্ম্যবোধে। এই তাদাত্ম্যবোধের দ্বারা যে নিরন্তর আত্ম-অতিক্রমের প্রবণতা, ইহা রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই আত্মাতিক্রান্তি (self-transcendence) রবীন্দ্রনাথের শিল্পানন্দকে একটা অতীন্দ্রিয়তা দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পায়নের ভিতরে অনেক স্থানে একটা অধ্যাত্ম

লোকোত্তরণ রহিয়াছে; ইহা তাঁহার সহজাত আত্মাতিক্রান্তিরই ক্রমপরিণতি।

শিল্পের মূলধর্ম সাধারণীকৃতির ভিতরেই শিল্পীর আত্মাতিক্রম এবং তৎফলে আত্মপ্রসার রহিয়াছে, কিন্তু আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের শিল্পায়নে যে আত্মাতিক্রম এবং আত্ম-প্রসারের কথা বলিতেছি, তাহা সাধারণীকৃতির আত্মাতিক্রম এবং আত্ম-প্রসার হইতে পৃথক্। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় আত্মাতিক্রমের প্রবণতা লিরিক্ কবিতার ক্ষেত্রে। লিরিক্ কবিতার ক্ষেত্রে আসল বিভাবাদি কবি নিজেই; সুতরাং সে-ক্ষেত্রে সাধারণীকৃত হ'ন কবি নিজেই—তাঁহার সকল চিন্তা ও বিচিত্র আনন্দানুভূতি লইয়া বিশ্বমানবের সহিত নিগূঢ় যোগে। কিন্তু অনেক লিরিক্ কবিতার ভিতরে রবীন্দ্রনাথের আর এক ধরণের আত্মাতিক্রান্তি আছে—যেখানে তিনি সমগ্র জীব-জগৎ, উদ্ভিদ্-জগৎ, জলে স্থলে প্রতিটি অণু-পরমাণুর সহিত নিজেকে যুক্ত এবং প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এই জাতীয় আত্মাতিক্রম এবং আত্ম-প্রসার তাঁহার এই জাতীয় লিরিক্ কবিতার কাব্যরসকে একটি বিশিষ্ট-গুণ-সমন্বিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই বিশিষ্টতার ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে একটা মিস্টিক্ অতীন্দ্রিয়তা।

কবির এই-জাতীয় আত্মাতিক্রমের সহিত কাব্যফলশ্রুতির অতীন্দ্রিয়তার কোন নিত্যসম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিযোগ নাই, অধ্যাত্মবাদের সহিত ত নয়ই। একান্ত অনাধ্যাত্মবাদীর পক্ষেও এই জাতীয় একটা ভাবাবেগ-জনিত আত্মাতিক্রম অতি সহজভাবেই দেখা দিতে পারে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টির ভিতরে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের মূল অধ্যাত্মবাদ এ সকল ক্ষেত্রেও তাঁহার শিল্প-দর্শন এবং রস-সৃষ্টির নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছে। জড়বাদীর দৃষ্টিতে কবির এই আত্মাতিক্রম-

স্পৃহাকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে আলোচনার সুবিধার জন্য এই আত্মাতিক্রমের ভিতরে কতগুলি স্তরভেদ করা যাইতে পারে। ইহার প্রথম স্তরে দেখি প্রাণি-জগতের সহিত কবির একাত্মতার আগ্রহ। ইহার কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মানুষ মননশীল প্রাণী; এই মননশীলতা একদিকে তাহার বর, অন্য দিকে তাহার অভিশাপ। চিত্তবৃত্তির স্থূল-সূক্ষ্ম, চপল-গভীর সর্বপ্রকার কম্প্র-গতিতে আমরা সর্বদা নানাখানা হইয়া আছি; মননের তীব্রতা বুদ্ধির রূপ পরিগ্রহ করিয়া শাসক এবং শোষকরূপে অন্তহীন উপদ্রবের সৃষ্টি করিতেছে। এই উপদ্রব আমাদের অনুভূতিকে সর্বদা খণ্ডিত এবং সীমায়িত করিয়া দিতেছে। অনুভূতির আরও গভীরতা এবং ব্যাপ্তির জন্য তাই আমরা আমাদের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা করি এমন একটি সত্তা, মন যেখানে একটি একান্ত অনভ্যর্থিত শয়তানের মতন তাহার নিরন্তর তীব্র বৃত্তি-চাঞ্চল্যের দ্বারা শুধু উৎপাত সৃষ্টি করিতেছে না। প্রাণের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রহিয়াছে অথচ মনের অনভিপ্রেত দৌরাত্ম্য নাই—এই জাতীয় অখণ্ডিত জীবনের আনন্দানুভূতির আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে মনুষ্য-উপাধি ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর প্রাণি-জগতের সহিত অদ্বয়যোগে যুক্ত করিয়া দিতে চাহে। জীবন-লীলার ক্ষেত্রে ইহা যেন একটি বিশেষ জাতি (species) হইতে সাধারণ জাতিতে (genus) গমন; 'বিশেষ'-এর সকল বৈশিষ্ট্যই জীবন-রসের পরিচ্ছেদক; এই পরিচ্ছেদ অপসারণেই জীবন-রসের অনাবিল এবং অবাধিত অনুভূতি। এই জন্যই—

"হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর

বহিতেছে অবহেলে,—দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্য-মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা,
হিংসা-তীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা—"

তাহার স্বাদ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও কখনো কবির নিকট দুর্নিবার হইয়া ওঠে। গান হিসাবে মানুষের গান অপেক্ষা পাখীর গানকে কবি অনেক স্থানে অধিক বরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার কারণ গানের ভিতর দিয়া জীবন-রসধারার যে অনাবিল স্বতঃ-উৎসারণ, পাখীর গানে তাহা কথা ও রাগ-রাগিণীর বন্ধনে শতধা পরিচ্ছিন্ন হইয়া বহুধা-পরিমিতত্ব লাভ করে নাই। তাই 'কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে' তেমন একটি সুর লাভ করা কবির নিকটে একটি প্রার্থিততম বস্তু ছিল।

কিন্তু পশুপাখীও চেতন প্রাণী; কবি ইহারই পরের স্তরে তাই আর একটি বিশুদ্ধ প্রাণ-প্রবাহের সন্ধান করিয়াছেন তৃণ-তরু-লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্-জগতের ভিতর দিয়া। এখানেই যেন প্রাণের আদিম ধারার অনাবিল প্রবাহ। কবির এই ভাবটি একটি সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাঁহার 'পঞ্চভূত'-এর 'মন' শীর্ষক লেখাটির ভিতর দিয়া। সেখানে তিনি বলিয়াছেন,—"কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আতা গাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়! তবে ঐ সরস-শ্যামল দারু-জীবনের মধ্যে কী বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়! তবে চিন্তায় উহার সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্যন্ত বৃদ্ধের

ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে।” এই লেখাটিরই অন্যত্র দেখিতে পাই,—“যদি কোনো প্রবল সয়তান সরীসৃপের মতো লুকাইয়া মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া শতলক্ষ আঁকা-বাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাখির গানের মধ্যে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিকপত্র, সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না!···

“তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তারেখাহীন জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া অরণ্যের ভাষাহীন মধুর ও তরঙ্গের অর্থহীন কলধ্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া তবে কতকটা স্নিগ্ধ ও সংযত হইয়া আছে। ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ নিবৃত্তি করিবার জন্য এই অনন্ত-প্রসারিত অমনঃসমুদ্রের প্রকাণ্ড নীলাম্বুরাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।”

এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, এখানে কবি যে ‘আবশ্যক’-এর কথা বলিলেন তাহাকে কোন আধ্যাত্মিক ‘আবশ্যক’ না বলিয়া একটি বিশুদ্ধ মানসিক আবশ্যকরূপেই গণ্য করা যাইতে পারে। এই আবশ্যকের মাত্রা মনের ভিতরে যতই বাড়িয়া যায় ততই জীবন-যাত্রার একটা পশ্চাদাবর্তন (Regressive process) বা প্রত্যাবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া হইল নিজের পরিচয়-পরিধিরূপ ‘বিশেষ জাতি’ (Species)-গুলিকে ক্রমে অতিক্রমণ এবং ক্রমবিস্তীর্ণ ‘সামান্য জাতি’র সহিত অন্বয়যোগে নিজের ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমগভীরীকৃত সত্তানন্দকে অনুভব করা।

কবি তাই শুধু উদ্ভিদ্-জগতের ভিতরে নিজেকে বিস্তৃত করিয়াই থামেন নাই—দূরে—অতিদূরে সমস্ত দেশকাল অতিক্রম করিয়া অন্ধকার রহস্যের গুহাহিত সৃষ্টির প্রথম উৎস-মূলে চলিয়া গিয়াছেন, সেখানকার প্রতিটি অণু-পরমাণুর প্রথম অস্তিত্ব ও প্রথম স্পন্দনের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া অনুভব করিতে চাহিয়াছেন। সেখানে চেতন-অচেতনের কোন প্রশ্নই নাই—সেখানে একটা সর্বব্যাপী বিশুদ্ধ সত্তা-মাত্রের ভিতরে একটা বিশুদ্ধ স্পন্দনের অনুভব। এই বিশ্বব্যাপী আত্মবিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষা কবিকে বার বার সমস্ত দেহমন-অনুভূতি লইয়া বিরাট্ বসুন্ধরার সহিত সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হইবার আকুতি দান করিয়াছে। বিরাট্ বসুন্ধরার অন্তর্লীন হইয়া আছে অস্তিত্ব ও আনন্দের অনন্ত সম্ভাবনা; সেই সম্ভাবনার অংশীদার হইবার জন্যই বসুন্ধরার নিকট ব্যাকুল আবেদন,—

—ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে; উত্তরে দক্ষিণে,
পূরবে পশ্চিমে; শৈবালে শাদ্বলে তৃণে

শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে ; যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে ; নবপুষ্পদল
করি পূর্ণ সঙ্গোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে ; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোলগীতে ; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্‌-দিগন্তরে ; শুভ্র উত্তরীয় প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দে নিভৃতে।

(বসুন্ধরা, সোনার তরী)

জড়বাদীর দৃষ্টিতে ইহাই হইল কবির ভাবাবেশে লোকোত্তরণের (poetic transport) তাৎপর্য। কবি যেখানে বলিলেন—

তাই আজি কোনো দিন—শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র 'পরে,
নারিকেল দলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহা ব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা

মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়।

সেখানকার আসল সত্য হইল, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে নিরন্তর অসঙ্গতরূপে বাড়াইয়া-তোলা মনটা লইয়া কবি এই একটি বেদনা অনুভব করিয়াছেন যে, শরৎ-প্রাতের সোনার আলো শিশির-ভেজা নারিকেলের পাতাগুলির প্রাণ-প্রবাহে যে আনন্দ-শিহরণ জাগাইয়া তোলে, একটি মানুষের দেহমনে সে তাহা পারে না; এই বেদনা ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া কবিমনকে আস্তে আস্তে চেতনার এমন একটি সুদূর অস্পষ্ট স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যেখানে বিশ্ব-জীবনের সহিত ক্রমাবগাহনের ফলে তাঁহার দেহ-প্রাণ-মন জুড়িয়া তিনি মাত্র সেইটুকু অনুভূতি বা স্পন্দন লাভ করিতেছেন যতটুকু অনুভূতি বা স্পন্দন লাভ ঘটে নারিকেল-পত্রগুলির শরতের আলো-হাওয়ার স্পর্শলাভে। ব্যক্তি-মন হইতে মানব-মন, মানব-মন হইতে জীব-প্রবৃত্তিতে, জীব-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভিদ্-প্রাণস্পন্দনে—সেখান হইতে ধীরে ধীরে একটি বিলীয়মান-নাম-রূপ অস্তিত্বের ভিতরে ক্রমাবগাহন—ইহাই শিল্পীর লোকোত্তরণ। এই জাতীয় লোকোত্তরণ বহুবার ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে। বহুবার ভাবাবেশে তিনি বলিয়াছেন—

ফিরিয়া এসেছি যেন আদিজন্মস্থলে
বহুকাল পরে, ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্ব জন্মে, জীবনের প্রথম উল্লাসে

আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ। (মধ্যাহ্ন, চৈতালি)

রবীন্দ্রনাথ নিজেই দু'-এক স্থলে তাঁহার এই উত্তরণ-মনোভাবটির স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন 'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্গত দু'-একখানি চিঠিতে—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাকত—আমি কত দূরদূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জলস্থলপর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে প'ড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকত তাই যেন মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্রে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে এবং নারকেলগাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে।"

জড়বাদীরা হয়ত বলিবেন, কবির এই যে আত্মাবগাহনের স্পৃহা ইহা মানুষের সহজাত প্রকৃতি (Instinct) ও বুদ্ধির চিরন্তন দ্বন্দ্ব-প্রসূত। এখানে বুদ্ধির অভাব-জনিত একান্ত একটা বিমূঢ়তা মাত্র নাই, এখানে আছে প্রবৃত্তি-রাজ্যের নিকট যুক্তি-রাজ্যের স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ। স্তিমিত চেতন-লোকে অনুপাধিক প্রবৃত্তির

এই দৃঢ় এবং গভীর আলোড়নই তথাকথিত সকল স্বর্গীয় উত্তরণের মূল কথা।

জড়বাদী দৃষ্টিতেও এই আত্মাতিক্রম-জনিত উত্তরণের ভিতরে একটা মিস্টিসিজ্‌ম্‌ স্বীকার করা যাইতে পারে, যদি বিশ্বব্যাপী একটা অদ্বয়বোধকেই মিস্টিসিজ্‌ম্‌-এর মূল ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শুধু ত অদ্বয়বোধ হইলেই হইবে না; সে বোধ বুদ্ধি-জনিত হইতে পারিবে না। তবে ইহাকে গ্রহণ করা হয় কিসের দ্বারা? এইখানেই 'অতিমন'-এর আবির্ভাবের সম্ভাবনা; মনের ক্রিয়া 'বুদ্ধি' যাহাকে লাভ করিতে পারে না, অতিমনের ক্রিয়া 'বোধি' তাহাকে সহজে লাভ করিতে পারে। বিরুদ্ধবাদিগণের মনে হয়ত সংশয় দেখা দিবে এইখানেই। যে বোধ মনের অতীত, তাহার ভিতরে বড় হইয়া ওঠে হয়ত প্রাণময়-কোষ ও অন্নময়-কোষের স্পন্দন। তবে ত মনোময়-কোষের এই আত্ম-সংহরণ এবং প্রাণময় ও অন্নময়-কোষের এই স্পন্দনের ভিতরে অবগাহনই অতিমনের আবির্ভাব-রহস্য। কাব্যভাবাবেশে লোকোত্তরণ কি তাহা হইলে এই মনলোক হইতে প্রাণলোক এবং অন্নলোকে প্রত্যাগমন?

রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শন তথা জীবন-দর্শন এই মতের একান্ত পরিপন্থী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' (মানসী), 'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী), 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী) প্রভৃতি কবিতার ভিতরে যে বিশ্বাত্মবোধ দেখা দিয়াছে, তাহাকে কোন অধ্যাত্মবোধ বা বিশ্বাসের সহিত যুক্ত না করিয়াও গ্রহণ করিতে খুব বেশী অসুবিধা হয় না; কিন্তু অসুবিধা মনে না হইলেও আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মূল অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের সহিত যুক্ত করিয়া না লইলে এই সকল কবিতার ভিতরকার বিশ্বাত্মবোধ একটা

উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবি-কল্পনামাত্রে পর্যবসিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই ভাবের এবং এই সুরের আরও অনেক কবিতা রহিয়াছে ; এইগুলিকে সমগ্র ভাবে বিচার করিতে হইলে এবং এই কবিতার অন্তর্নিবিষ্ট রস সম্যক্ আস্বাদন করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের মূল অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের সহিত ইহাকে যুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এই-জাতীয় কবিতার ভিতরে রবীন্দ্রনাথের যে মিস্টিসিজ্‌ম্ রহিয়াছে, তাহার পটভূমিকায় রহিয়াছে উপনিষদের অদ্বয়-বাদ। সকল পশু-পাখী, জীব-জন্তু, তৃণ-তরুলতা, জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে যাহা কিছু সকলের সহিত এই যে নিগূঢ় ঐকাত্ম্যের অনুভূতি ইহার পশ্চাতে আর একটি গভীরতর বিশ্বাস ব্যঞ্জিত হইয়াছে—বিশ্বস্থ সকল কিছুই একই সৃজনী-শক্তির, একই প্রাণ-শক্তির লীলা।

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে,—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়। (নৈবেদ্য)

বিশ্বব্যাপী এই যে একই প্রাণের তরঙ্গ, ইহাই তৃণ-তরু-লতাকে সর্বদা প্রিয়তম করিয়া রাখিয়াছে। তৃণ-তরু-লতারও তাই বাণী ছিল, সে ছিল প্রাণের বাণী, তাহাকে শুনিতেও হয় তাই কানে নয়, প্রাণে।

ইহাদের ভাষা হইতেছে 'জীব-জগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে।' কবি 'বনবাণী'র ভূমিকায় তাই বলিয়াছেন,—'ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন।' যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হ'লে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। 'পত্রপুটে' কবি বলিয়াছেন, এক 'আদিত্যবর্ণ' মহান্ পুরুষের আবির্ভাব সবিতার ভিতর দিয়া, আর সবিতা সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

আমার অন্তরতম সত্য
আদিযুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন
সেই সত্য তোমারই। (১০ সংখ্যা)

ইহা অপেক্ষা অনেক স্পষ্ট করিয়াও রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন; 'জীবন দেবতা'র সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন,—"তিনি যে কেবল আমার ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি—সেইজন্য এতো

বড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।”

(আত্ম-পরিচয়, ১)

বিশ্বজগতের সহিত এই নিবিড় অধ্যাত্মযোগের প্রমাণ রবীন্দ্রকাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই ; তাহার প্রাচুর্য সুবিদিত। এই অধ্যাত্ম অদ্বয়যোগই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিসিজ্‌ম্‌-এর গোড়ার কথা। কিন্তু কথা উঠিবে, ইহা ত রবীন্দ্রনাথের মিস্টিসিজ্‌ম্‌-এর পরিচয় ; ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধ বা তাঁহার সৃষ্ট রসের সম্পর্ক কি ? আমি প্রারম্ভেই বলিয়াছি, মূলতঃ জীবনবোধ আর শিল্পবোধে কোন পার্থক্য নাই, উভয়ের ভিতরে আছে অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্ক। সুতরাং জীবনবোধের এই বৈশিষ্ট্য শিল্পবোধেরও নিয়ামক হয়। শিল্পরসকে আমরা যদি একটা অলৌকিক হ্লাদ-গোচরতা বলিয়া বর্ণনা করি, তবে নিজের আসল প্রকৃতিতে সে এক এবং অখণ্ড। আমাদের বিশেষ বিশেষ চিন্তা-ভাবনা, রুচি-প্রবণতা, জ্ঞান-বিশ্বাসের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়াই আমাদের ‘এক’ শিল্পানন্দও ‘বহু’বৈচিত্র্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ চিন্তা-ভাবনা, রুচি-প্রবণতা, জ্ঞান-বিশ্বাসও তাঁহার সৃষ্ট শিল্পরসকে বিশেষ কতগুলি প্রকৃতি দান করিয়াছে। অধ্যাত্মবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার মিস্টিক্‌ মনোধর্মও তাই তাঁহার সৃষ্ট শিল্পরসকে বহু স্থলে অধ্যাত্মগন্ধি করিয়া তুলিয়াছে। এই অধ্যাত্মগন্ধিত্বকে আমি কোন লঘু অর্থে গ্রহণ করিতেছি না ; পুষ্পের সহিত গন্ধের যেমন সমবায়-সম্বন্ধ, রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় লিরিক্‌ কবিতার ক্ষেত্রেও শিল্পরসের সহিত আধ্যাত্মিকতার সেই জাতীয় একটা সমবায়-সম্বন্ধ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কবিতা ও গান স্পষ্টতঃই আধ্যাত্মিকতাকে

অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে আমি এ-কথা বলিতেছি না; আমি এ-কথা বলিতেছি সেই সকল গান ও কবিতা সম্বন্ধে যেখানে আধুনিক সংশয় এবং জড়ব্যাখ্যার অবকাশ রহিয়াছে এবং যেগুলির ভিতরে সাধর্ম্য এবং বৈপরীত্যের তুলনায় আধুনিক শিল্পবোধের সহিত রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধের পার্থক্যটাকে স্পষ্ট করিয়া ধরা যায়।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের সহিত আধুনিক যুগের শিল্পদর্শনের আর একটা প্রকাণ্ড অমিল ইতিহাসের সহিত শিল্পীর সম্পর্ক বিষয়ে। প্রশ্নটা সাদাসিধা ভাবে এই, চলিতেছে কে, আর পিছন হইতে ঠেলিতেছেই বা কে? রবীন্দ্রনাথের যেটা বিশ্বাস ছিল তাহাতে বলা যায়, চলিতেছে ইতিহাস, তাহাকে পিছন হইতে ঠেলিতেছে মানুষ; অপর পক্ষের সিদ্ধান্তে, পিছন হইতে নিরন্তর ঠেলিয়া দিতেছে ইতিহাস, তাহার ঠেলার বেগে চলিতেছে মানুষ। আমরা এত দিন যে ভাবে শুনিতে ও ভাবিতে অভ্যস্ত তাহাতে এই পরবর্তী সিদ্ধান্তটা কানে ঠেকে অনেকখানি উল্টা। আমরা এত দিন জানিতাম, ঘোড়া গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়; কিন্তু হঠাৎ যদি একটি প্রবল দল চিৎকার করিয়া রাস্তার পাশ হইতে বলিতে থাকে যে গাড়ীটাই ঘোড়াটাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে সহসা কথাটাকে যেমন করিয়া বেসুরা লাগে, আধুনিক মার্ক্স্‌পন্থী সিদ্ধান্তও আমাদের অনেকের কানে হয়ত তেমনই বেসুরা ঠেকে। এই দুই পরস্পরবিরোধী মতবাদের কোনও পক্ষের সহিতই নিজেদের একেবারে মিলাইয়া না দিয়াও বলা যাইতে পারে, গাড়ীও যে ঘোড়াকে ঠেলিয়া লইয়া যায়

এ কথাটাও একেবারে মিথ্যা নয়। ঘোড়ার ভিতরে একটা চলনক্ষমতা আছে, তাই বলিয়া ঘোড়া আপনা-আপনিই সর্বদা চলিয়া বেড়ায় না, পিছনে যে গাড়ীটি জুড়িয়া দেওয়া হয়, সেই গাড়ীতে যে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার বা লোকসমূহ চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহারাই কতগুলি বাস্তব হেতু-প্রত্যয় (objective condition) রূপে কতগুলি প্রয়োজন উৎপাদন করে, সেই প্রয়োজনগুলিই অদৃশ্য শক্তিরূপে সম্মুখস্থ অশ্বশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তেমনই জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষেরই আপনা-আপনি চলিবার ক্ষমতা আছে, দৈহিক এবং মানসিক উভয়বিধ। কিন্তু তাই বলিয়া মানুষ আপনা-আপনি নিজের খেয়ালখুশীতেই চলিয়া বেড়ায় না, এবং এই প্রতি মানুষের খেয়ালখুশীর চলিয়া বেড়াইবার একটা মোট হিসাব যোগ করিলে যাহা গিয়া দাঁড়ায় তাহাকেই মানুষের ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মাণ্ডের বিধি-লিপি (এ 'বিধি' জড়ই হোক্ বা দৈবই হোক্) মানুষের পশ্চাতে একটি বিরাট সমাজ-জীবনের গাড়ী জুড়িয়া দিয়াছে। তাহার ভিতরে বস্তু ও মানুষে মিলিয়া নিরন্তর এক ভিড় জমিয়া গিয়াছে; এই বাস্তব হেতু-প্রত্যয়গুলি (objective conditions) সমাজ-জীবনের অন্তস্তলে দৃশ্য-অদৃশ্য কতগুলি শক্তি উৎপাদন করিতেছে; এই দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তির ধাক্কা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে লাগিতেছে গিয়া প্রত্যেক মানুষের উপর, তাহা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে মানুষের সকল চলা। তাই বলিয়া মানুষ যন্ত্রচালিত নিছক কতগুলি পুতুলমাত্র নয়; সে চেতনাসম্পন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন স্বাধীন জীব। কিন্তু এই ইচ্ছার স্বাধীনতা শব্দের অর্থ এই যে, সব মানুষই শুধু না জানিয়া-শুনিয়া পিছন হইতে দুর্নিবার ঠেলা খাইয়া চলে না, পিছনে কি শক্তি কাজ করিতেছে তাহাকে জানিয়া-বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সেই শক্তিকে স্বীকার করিয়া চলে।

মানুষের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি তাঁহারা ভালরূপ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন; সেই বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা দেখা গিয়াছে, এই ইতিহাসের অন্তরে একটা জঙ্গমশক্তি রহিয়াছে; সেই জঙ্গমশক্তির গমনের ধারা কোথাও নেহাৎ খাপছাড়া বা খেয়ালী নয়; ইহার ভিতরে নিয়ম এবং উদ্দেশ্য রহিয়াছে। এই নিয়ম এবং উদ্দেশ্যবোধের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তে ভাসিয়া আসিয়াছে কতগুলি শ্রেয়োবোধ এবং পরম কল্যাণের বোধ। এই পরম কল্যাণের আদর্শকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজশক্তির সকল গতি-প্রকৃতিকে ভালরূপে জানিয়া-বুঝিয়া স্বেচ্ছায় এই বিপুল আবর্তনের ভিতরে নিজের অংশ বাছিয়া লওয়া—ইহাই মানুষের জীবনের চলার পথে সত্যকার স্বাধীন পথ।

বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে যাহা সত্য, শিল্প-জীবনের পক্ষেও তাহাই সত্য; সুতরাং মার্ক্স্‌বাদকে স্বীকার করিতে হইলে শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণ এবং বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সহিত ব্যক্তি-জীবনের অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস এবং চিন্তাধারা ছিল এ-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনধারা এবং স্বাধীন মনের লীলাবৈচিত্র্যের উপর ইতিহাসের এই কঠোর নিয়ন্ত্রণের দৌরাত্ম্যকে তিনি তাঁহার জীবনে কখনই বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। এই প্রতিবাদের স্পষ্টতম প্রকাশ রহিয়াছে তাঁহার 'সাহিত্যের স্বরূপ'-এর 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলিয়াছেন,—"আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত এ-কথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর কিছু নই কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের

বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যস্রষ্টার কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়।”

শিল্প-প্রতিভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, ও-জিনিসটা সকল সমাজ ও ইতিহাস-নিরপেক্ষ শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস—ওটা মানুষের আত্মার ধর্ম। এই আত্ম-ধর্মে মানুষ যাহা কিছু করে ইতিহাস বা সমাজ বড় জোর তাহার ভিতরে কিছু উপকরণ জোগাইয়া দেয়। “সৃষ্টিকর্তা যে, তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায় কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরী করে না।” মানুষকে তৈরী করে সম্পূর্ণ তাহার আত্ম-ধর্ম; শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি তাহার এই আত্মধর্মেরই প্রকাশ, এই আত্মধর্মের প্রকাশেই তাহার শিল্পের চরম সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের মতে তাই শিল্পী অসঙ্গ—সম্পূর্ণ একাকী—কেবল। ‘কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে নিয়ে রচনা করে।’

রবীন্দ্রনাথের এই মূল সিদ্ধান্ত হইতে আপনা-আপনি কতগুলি অনুসিদ্ধান্ত বাহির হয়। প্রথমতঃ, শিল্প হইল একান্ত ভাবে অপ্রয়োজনের আনন্দ। ইতিহাসের সহিত—অর্থাৎ বহির্বিশ্বের প্রবল আবর্তনের সহিত—যখন শিল্প-সৃষ্টির কোন মৌলিক যোগ নাই, তখন শিল্প-সৃষ্টির মুখ্য কারণ এবং উদ্দেশ্য শিল্পীর আত্মানন্দ। শিল্পী শুধু আত্ম-লীলামুগ্ধা কিশোরী বালিকার ন্যায় গোধূলির আবছা অন্ধকারে কাশের বনের শূন্য নদীর তীরে নিজের খেয়াল-খুশীতে অকারণে শিল্পের প্রদীপ ভাসাইয়া দিয়া যায়, তাহার শিল্পের আলোখানিকে আকাশ-প্রদীপ করিয়া অকারণে শূন্যে তুলিয়া দেয়, অথবা লক্ষ দীপের সঙ্গে

অকারণে দীপালির উৎসবে সাজাইয়া দেয়। এই যে বিশুদ্ধ শিল্পানন্দ —ইহা মানুষের জীবনের একটা উপরি-পাওনা—জীবনের ক্ষেত্রে এটা একটা উদ্‌বৃত্ত বস্তু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এটা হইতেছে—'the surplus in man'। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই, ইহার সৃষ্টি বাঁচিয়া থাকিবার উর্ধ্বে বিশুদ্ধ আনন্দলীলার জন্য। শিল্পের এই যে আনন্দলোক, ইহার সহিত আমাদের ধূলিক্লিন্ন ঘর্মসিক্ত সংগ্রামক্লান্ত জীবনের কোন যোগ নাই—দৈনন্দিন সংবাদপত্রের কোন 'ব্যাপক ব্যাপার' বা 'গুরুতর পরিস্থিতি' এই আনন্দলোকের অবস্থিতিকে বিশেষ কোন স্থিতিস্থাপকতা দান করে না।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প বৃহত্তর মানব-সমাজের জন্য সৃষ্ট নয়; ইহা মুখ্যতঃ শিল্পীর আত্মপ্রসাদের জন্যই সৃষ্ট। সংসারের বহু জন ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিল না করিল, ইহাতে সমাজের কি উপকার হইল না হইল, অথবা ইহা বহুজনের আনন্দবিধান করিতে পারিল না পারিল শিল্পীর নিকট ইহা বড় কথা নয়, বড় কথা— তাঁহার আত্ম-ধর্মের মধ্যে নিরন্তর বিচিত্র ভাবে আত্ম-প্রকাশের ভিতর দিয়া আত্মোপলব্ধির যে একটা তাগিদ রহিয়াছে তাঁহার জীবনের নিরলস সাধনার ভিতর দিয়া তিনি তাহাকে কতখানি সার্থক করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এই বিচিত্র আত্মোপলব্ধিজনিত যে আত্মপ্রসাদ ইহাই জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হাসি, 'চিত্রা'র 'সাধনা' কবিতাটির ভিতরে রহিয়াছে এই সত্যেরই ইঙ্গিত। আদর্শের দিক হইতে শিল্প-জগৎটি ছিল তাই সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের নিজের জগৎ। এই নির্জন জগতের ভিতরে তিনি যতটা সম্ভব আত্ম-সমাহিত হইয়া বহুর মতামতরূপ কোলাহলকে এড়াইয়া চলিতে চাহিতেন।

এই প্রবল অন্তর্মুখিতা এবং বহির্বিমুখিতাই রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মকে তাহার সকল রোম্যান্টিকতা দান করিয়াছে। আত্মরতিই যেখানে শিল্পের মূল লক্ষ্য সেখানে সমগ্র বহির্জগৎ কবির নিকট শুধুমাত্র আত্ম-প্রকাশের উপলক্ষ বা অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিশ্বজগতের যেখানে যাহা কিছু আছে কবি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে তাহাদিগকে শুধু গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অন্তঃস্থিত একটি বিশ্বগ্রাসী 'আমি'র ভিতরে সংহরণ করিয়া লইয়াছেন। এই নিরবচ্ছিন্ন সংহরণের ভিতর দিয়া কবির মধ্যে যে একটি বিরাট্ 'আমি' কেবলই গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার ভিতরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সংহৃত হইয়াছিল—অনন্ত রহস্য, অসীম বিস্ময়ের মূর্তিতে। হৃদয় হইতে সেই রহস্য—সেই বিস্ময় ঢালিয়া ঢালিয়া আবার চলিয়াছে কবির যাহা কিছু শিল্পরূপায়ণ। এই রোম্যান্টিক্ ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ কেবল তাঁহারই শিল্পধর্মের কোন বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তাঁহার মতে ইহাই শিল্পের সাধারণ ধর্ম।

বহুবাদী বহুর নিকট হইতে এবং বহু কোলাহলময় বাহির হইতে নিজেকে গুটাইয়া রাখিবার সহজাত স্পৃহা রবীন্দ্রনাথকে জন্ম-পলাতকা করিয়া তুলিয়াছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে 'পলাতকা'কে আমরা আজকাল যত বড় গাল বলিয়া মনে করি না কেন, এই পলাতকা-বৃত্তিকেও তিনি তাঁহার সহজ শিল্পিধর্ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ মার্ক্স্‌বাদীর দৃষ্টি লইয়া বিচার করিতে বসিলে রবীন্দ্রনাথের উপরি-উক্ত সকল শিল্পাদর্শের সহিতই গভীর অমিল হইবার কথা। এই অমিলগুলির কথা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইলে বলা যায়, শিল্পী তাঁহার শিল্পজগতে একক এবং অসঙ্গ—এ-কথা মূল শিল্পিধর্মেরই বিরোধী; শিল্প অপ্রয়োজনের আনন্দ—এ-কথা অশ্রদ্ধেয়; জীবন-

যাত্রার জন্য আর যাহা কিছুরও যেমনতর প্রয়োজন, শিল্পেরও সেইরূপ অবশ্য প্রয়োজন; শিল্পসৃষ্টি শিল্পীর কল্পনা-বিলাস-জনিত খেয়ালখুশীর আনন্দের জন্য নহে, ইহার সৃষ্টি সবটাই জন-গণের জন্য। বৃহৎ জন-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বৃহৎ জন-সমাজকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিয়া শিল্পের নামে যে আত্মরতির আয়োজন উহার সবটাই অপচেষ্টা। শিল্পের সার্থকতা সবটাই সমাজ-জীবনে তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বের দ্বারা। শিল্পীও কাজ করে—এই যুধ্যমান ঘর্মসিক্ত ধূলিক্লিন্ন সংসারের জন্যই কাজ করে—যেমন সংসারের জন্য কাজ করে ক্ষেতের চাষী—রাস্তার কুলী-মজুর—কারখানার শ্রমিক—যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক। শিল্পের নাম করিয়া ইহার ভিতরে যাহারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্বক পলাতকা সাজিবে তাহারা সমাজ কর্তৃকও ধিক্‌কৃত ও পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের এই যে সকল শিল্প-বিশ্বাস এগুলির মূল বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মার্ক্স্‌পন্থীদের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিতে বিচার করিয়া দেখিলে সংক্ষেপে বলিতে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় সকল বিশ্বাসই ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া পুঁজিবাদ হইতে প্রসূত। এই বুর্জোয়া পুঁজিবাদ সবটা স্থানীয় ছিল না, ইহার ভিতরে অনেকখানি ছিল সাগর-পারের ঢেউ। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের যে বাড়-বাড়ন্ত, রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবন প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে ইহারই সহিত যুক্ত; এবং এই পুঁজিবাদেরই একটি সূক্ষ্ম সুকুমার ছদ্মরূপ প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের শিল্পবাদের ভিতর দিয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিত্য-নূতন আবিষ্কারের ফলে দেখা দিতে লাগিল নিত্য অগ্রগতি; এই অগ্রগতির অনিবার্য প্রভাব পড়িল বাণিজ্যের বাজারে; সেখানে দেখা দিল পরস্পরগ্রাসী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা; এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার

জন্য সৃষ্ট হইল 'অবাধ-বাণিজ্য'। এই অবাধ-উৎপাদন এবং 'অবাধ-বাণিজ্য' ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌-এর ভিতরে যে একটা চরম রূপ ধারণ করিল তাহা মানুষকে তাহার সমাজ-রূপ মাতৃদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার মনোবৃত্তি জাগ্রত করিয়া দিতে লাগিল। সমাজ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বয়ংস্বতন্ত্র না হইতে পারিলে, অবাধ-উৎপাদন এবং অবাধ-বাণিজ্যের চরম ফল ভোগ করা যায় না। সুতরাং এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থনের জন্যই আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিতে লাগিল এই স্বাতন্ত্র্যের জয়গান। পুঁজিবাদ-প্রসূত এই যে স্বাতন্ত্র্যের জয়গান, ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর সকল কলা-কৈবল্য এবং শিল্পীর একাকিত্ব এবং অসঙ্গত্বের মূলে। কারখানার মালিক যে, তাহার আত্মরক্ষার জন্যই চাই এই স্বাতন্ত্র্যবাদ—রাজা-মহারাজা জমিদার তালুকদার প্রভৃতির আত্মরক্ষার জন্যই চাই এই স্বাতন্ত্র্যবাদ; এই স্বাতন্ত্র্যবাদকে ফলাও করিয়া তুলিবার জন্য পিছনে চাই আবার দৈব-অধিকারের সুযোগটি; নতুবা যে সকলের সঙ্গে সমানে ভাগ করিয়া ভোগ করিবার একটা প্রশ্ন ওঠে। শ্রেণীভেদের বনিয়াদটি পাকা করিবার জন্যই তাই চাই দৈব-অধিকার এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত স্বাতন্ত্র্যের মহিমা। মোটের উপরে তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীদের যে অসঙ্গ একাকিত্বের মতবাদ, উহাও উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেণীসংগ্রাম-প্রসূত। উনবিংশ শতাব্দীর অবাধ-উৎপাদন এবং অবাধ-বাণিজ্য প্রথা সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে যে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই জাগাইয়া তুলিল শ্রেণী-সংগ্রাম। বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সমাজ তখন আত্মরক্ষার বর্ম খুঁজিতেছিল চরম স্বাতন্ত্র্যবাদে। শিল্পীরাও এই যুগে যথেচ্ছ শিল্পোৎপাদন এবং তাহার অবাধ-পরিবেশনের জন্য মরিয়া হইয়া এই স্বাতন্ত্র্যের জয়গান করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকেই দেখা যায়, নিত্য-নূতন তাল তাল সোনা উৎপাদিত হয় যে যক্ষপুরী হইতে, সেই যক্ষপুরীর রাজা নিজেকে নিজে সর্বদা জালের ভিতরে ঘিরিয়া রাখেন, এবং সেই জালের আড়ালে চলে তাহার অসঙ্গ একাকী জীবন, তাহাতে দুঃখ-কষ্ট আর যাহাই থাক নিজের স্বতন্ত্র ভোগাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বাহিরের সকল শ্রেণী-সংগ্রামকেও অনেকখানি এড়াইয়া চলা যায়। মার্ক্স্‌পন্থীরা রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কেও হয়ত এই কথা বলিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথেরও প্রভাত-সংগীতেই দেখি—

রোদন, রোদন, কেবলই রোদন,
কেবলি বিষাদশ্বাস,
লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস!
নাই কোন কাজ,—মাঝে মাঝে চাস্
মলিন আপনা-পানে,
আপনার স্নেহে কাতর বচন
কহিস আপন কানে।
দিবস-রজনী মরীচিকা-সুরা
কেবল করিস্ পান।
বাড়িতেছে তৃষা, বিকারের তৃষা
ছট্‌ফট্ করে প্রাণ।
দাও দাও বলে সকলি যে চাস্
জঠর জ্বলিছে ভুখে,
মুঠি মুঠি ধূলা তুলিয়া লইয়া
কেবলি পূরিস মুখে। —(আহ্বান-সংগীত)

ইহাও কি সেই যক্ষপুরীর রাজধর্মেরই বিশেষ প্রকাশ? সেই বিশ্বগ্রাসী জঠরানল—যত পাই, কিছুতেই তৃপ্তি নাই। সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে বৃহৎ জনমানব হইতে; তাহাতে আত্ম-ভরণ-জনিত আনন্দও আছে—আবার আছে নিজের বিরুদ্ধে নিজের তীব্র প্রতিক্রিয়া, যেটা হইল বুর্জোয়া পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত আত্ম-দ্বন্দ্ব। যে আত্মঘাতী স্ববিরোধ অনুস্যূত হইয়া আছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া আর্থিক ব্যবস্থায়—তাহার সমাজ-ব্যবস্থায়, সেই স্ববিরোধই ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পে—তথা রবীন্দ্রনাথের শিল্পে ক্ষণে ক্ষণে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে শিল্পীর নিজের শিল্পিধর্মের বিরুদ্ধে একটি তীব্র প্রতিক্রিয়ায়। তাই কৈশোর হইতেই দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের এই আত্ম-দ্বন্দ্ব।

নিষ্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে,
লোক-মাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে।
ভাসায়ে জীবন-তরী সাগরের মাঝে,
তরঙ্গ লঙ্ঘন করি পারি না বাহিতে।
পুরুষের মতো যত মানবের সাথে
যোগ দিতে পারি না তো লয়ে নিজ বল,
সহস্র সংকল্প শুধু ভরা দুই হাতে
বিফলে শুকায় যেন লক্ষ্মণের ফল।
আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।

কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি,
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি ॥
—(স্বপ্নরুদ্ধ, কড়ি ও কোমল)

মার্ক্স্‌পন্থীদের মতে এই আত্ম-প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কোন ধর্ম নহে, ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ শিল্পি-ধর্ম। কিন্তু যতই আত্ম-প্রতিক্রিয়া থাক, ঐ অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের 'সূক্ষ্ম রেশমের জাল' কাটিয়া তাঁহারা শেষ পর্যন্ত কিছুতেই বাহিরে আসিতে পারেন নাই; তাহার কারণও হয়ত এই যে, একজন কবি নিজের ইচ্ছায় এই সূক্ষ্ম রেশমের জাল কাটিয়া উঠিতে পারেন না; সমাজধর্মের পরিবর্তন না ঘটিলে এই শিল্পধর্মের পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস সে যুগের ধাতুতে তৈরী, সে ধাতুর পরিবর্তন না ঘটায় রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই—

'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।'—

এই আক্ষেপই করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই অসঙ্গত এবং একাকিত্বের খোলসের ভিতরে বুর্জোয়া পুঁজিবাদ যতই নিরাপত্তা খুঁজুক না কেন, 'অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?' এই আত্মকেন্দ্রিকতা, এই আত্মরতির ভিতরেই নিহিত আছে তাহার আত্মঘাত। আত্ম-তোষণ এখানে আত্মপ্রতাড়ন, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও, শিল্পের ক্ষেত্রেও। এই পুঁজিবাদীদের সম্বন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়ই বলা যাইতে পারে,—

যত দিন বেঁচেছিল
আমি জানি কি তারে দহিত।

সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না!
জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ড, ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে
যত হাসে ততই সে দহে।
তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত দহিত তারে, দহিত কেবল।
জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ বিজন তেয়াগি,
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে—
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।

—(তারকার আত্মহত্যা, সন্ধ্যাসংগীত)

এই যে একটি তারকার জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ লোককে ত্যাগ করিয়া 'আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি' যাত্রা ইহাই তারকার আত্মহত্যা; সমষ্টির সমাজ-সত্তাকে এড়াইয়া এই অসঙ্গত্বের লোভই যেখানে পৌঁছাইয়া দেয় তাহা আত্মরক্ষা নয়, আত্মহত্যা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্ম সম্বন্ধে এই জাতীয় মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা আর কে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না; কিন্তু কবির কানে কোনও-রূপে ইহা পৌঁছিলে তিনি করজোড়ে যে কথাটি অবশ্যই বলিতেন তাহা হইল এই,—"অন্য শত রকমের তাপ তুমি যথেচ্ছ ভাবে দাও; হে চতুরানন, সে সকলই সহ্য করিব; কিন্তু এই জাতীয় মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা আমার 'শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ'।" কিন্তু কেন? আপত্তি কোথায়? আপত্তি একেবারে মূলে—মূল জীবন-দর্শনে। শিল্পের ক্ষেত্রে যে অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের যত মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা তাহার

মূলে রহিয়াছে Dialectic Materialism, আর রবীন্দ্রনাথের যে শিল্পের ক্ষেত্রে অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের মতবাদ তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে তাঁহার একটি দৃঢ়মূল অধ্যাত্ম-বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের কারণ স্বরূপেও হয়ত উনবিংশ যুগীয় অনেক বাস্তব হেতু-প্রত্যয় (objective conditions) খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে; উনবিংশ শতাব্দীর উৎপাদন-প্রথার বৈশিষ্ট্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদের যে কি কার্য-কারণ সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাও হয়ত আবিষ্কৃত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা মানুষের এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাসকে শুধুমাত্র উৎপাদন-প্রথাজাত একটা মানসিক বিকারমাত্র মনে না করেন, তাঁহাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের অসঙ্গত্ব ও একাকিত্বের অন্য যে ব্যাখ্যা থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া দরকার।

এ ক্ষেত্রেও মার্ক্স্‌পন্থীদের সহিত রবীন্দ্রনাথের একটা জায়গায় গভীর মিল রহিয়াছে, সে মিলটি এই যে, অংশীকে বাদ দিয়া অংশ কখনও সত্য নয়; সমগ্রতাই সত্য; সমগ্র-নিরপেক্ষ এক নিরর্থক। এখন প্রশ্ন এই, মানুষের জীবনে একটি মানুষ যদি অংশ হয় তবে তাহার অংশী হইবে কে? জড়বাদ বলিবে, সমাজ। অতএব সমাজ-নিরপেক্ষ যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কল্পনা, উহা ব্যক্তিকে দান করিবে নৈরর্থক্য; ব্যক্তির সার্থকতা সমাজের সহিত যে তাহার যোগ তাহার নিবিড় অনুভূতিতে। সেই নিবিড় অনুভূতি হইতে উৎসারিত যে শিল্প তাহাই শুধু সার্থক। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস তাঁহার কবিপুরুষের সার্থকতা পৃথিবীর বহুপুরুষের মিলনে সৃষ্ট সমাজের সহিত যোগে নয়, বিশ্বব্যাপী এক পরম পুরুষের সহিত যোগে। এই বিশ্বব্যাপী পরম পুরুষ আদি শিল্পী—শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আসল যোগ এই আদি

শিল্পীর সহিত। জনগণ এখানে অস্বীকৃত নয়, অতিক্রান্ত,—অথবা একের ভিতরে—সমগ্রতার ভিতরে সমাহিত; সুতরাং সেই একেকে জানিলে ও জানাইলে সব কিছুই জানাও হয়, সব কিছুকে জানানও হয়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পস্রষ্টা হিসাবে যে অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের ধারণা তাহা তাঁহার ঔপনিষদিক এক পুরুষের ধারণার সহিত যুক্ত; যিনি শুধু এক নন,—সকলের ভিতরে এক, একের ভিতরে সব। এই একের বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মানসিক পরিমণ্ডলের এই একটা বিশ্বাস জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ভাসিয়া বেড়াইত যে, তাঁহার গানের শেষ লক্ষ্য, সুতরাং আসল লক্ষ্য হইতেছে সেই এক। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

মর্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ, প্রভু,
মর্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্য কাজে; সর্ব কর্ম সারি
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমার পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে;—
কবি আপনার গানে যত কথা কহে
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি,
তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি!

সংসারকে কবি এখানে একেবারে বঞ্চিত করিতে চাহেন নাই বটে, কিন্তু শেষ লক্ষ্য অন্য হওয়াতে সংসারের ভার কমিয়া গিয়াছে, তাহারই ফলে কবি সর্বত্র না হইলেও বহু স্থলে সংসারের সকল স্তুতি-নিন্দা, লাভ-লোকসানের প্রতি উদাসীন হইয়া উঠিয়াছেন। সংসারের প্রতি এই সহজ ঔদাসীন্যের সহিত তাঁহার অসঙ্গত্বের বিশ্বাসের পারস্পরিক যোগ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই যে বৃহত্তর সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্নতা—তাহা নিরালম্ব বিচ্ছেদ নয়,—বিচ্ছেদের লোকসান অল্প—একের সহিত নিবিড় মিলনে ক্ষতিপূরণ অনেক বেশী।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের ধারণা সর্বত্র যে স্পষ্ট একটা সাধারণে প্রচলিত ধর্মবোধরূপেই দেখা দিয়াছে তাহা নয়; রবীন্দ্রনাথের গভীর শিল্পবোধ তাঁহার ধর্মবোধের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকিলেও এই শিল্পবোধ সর্বত্র ধর্মবোধের আওতায়ই প্রকাশ পায় নাই। 'খেয়া'র 'অনাবশ্যক' কবিতার ভিতরে বা 'চিত্রা'র 'আবেদন' কবিতার ভিতরে যে অসঙ্গ বিজনপথে শিল্প-সাধনায় আত্ম-প্রসাদের উল্লাস দেখা যায়, তাহা স্পষ্ট কোন ধর্মবোধাশ্রিত নহে। সেখানকার ধরণটা অনেকখানি কলাকৈবল্য-পন্থী (Art for Art's sake)। কিন্তু এই কলাকৈবল্যপন্থী ভাব ও উক্তি রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক ও অন্যান্য লেখার ভিতরে বহু স্থানে দেখা গেলেও, রবীন্দ্রনাথের কবি-মনটিকে সমগ্র ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথের এই কলাকৈবল্যবাদ একেবারে নিরালম্ব নহে, 'জীবন-দেবতা'র উপরে তাহার একটা প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে বহু ভাবে বলিয়াছেন যে, তাঁহার শিল্প-

সৃষ্টির কারখানায় তিনি একেবারে একা এবং সেখানকার যে সৃষ্টির আনন্দ তাহা মুখ্যতঃ তাঁহার নিজের। সাধারণ ভাবে বিচার করিলে, এই মতটি শিল্পের মূলধর্মেরই বিরোধী। শিল্প অর্থই হইল এমন একটা সৃষ্টি, যাহা মূলতঃ হৃদয়-সংবাদী (communicative)। যে কোন শিল্পই তাই শ্রোতা বা দ্রষ্টার অপেক্ষা রাখে। শিল্প-ব্যাপারটাই মূলতঃ একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, একটা সামাজিক ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ-কথা নিজেই অনেক স্থানে অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একেবারে খাঁটি ভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে। অনেকে কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখী যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের রচনার উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত—পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া থাকেন।

"পাখির গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ্য নাই, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। না থাকে ত না-ই রইল, তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা—কিন্তু লেখকের রচনার প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ।" —(সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্য)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ নিছক 'বাজে কথা' আখ্যা দিয়াছেন। "সাহিত্যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসও সেই রকমের একটা কথা। রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে—এবং সেইটা ধরিয়া লইয়াই বিচার করিতে হইবে।" শুধু তাহাই নহে, জীবনে কোন কিছুর মহিমা প্রকাশ করিতে হইলেই তাহাকে অপরের কাছে বড় করিয়া বলিতে হয়। বড় করিয়া বলিতে হইলেই সুর চড়াইতে হয়; এই সুর চড়ানটাই হইল আসল শিল্পকলা। এই সুর চড়াইতেই

লাগে রঙ, রেখা,—লাগে ছন্দ, অলঙ্কার, বিচিত্র ভঙ্গি। শিল্পকলার যাহা কিছু আয়োজন—যাহা কিছু কলাকৌশল, সকলই হইল নিজের কথাকে পাঠক-সমাজে প্রকাশ করিবার জন্য। "এমন কি, মা-ও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা দূর করিয়া দেয়, তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে তাহা নয়, পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়। নিজের কাছে দুঃখ-সুখ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না—পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোক-প্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক, শোক প্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।"—(সাহিত্যের বিচারক, সাহিত্য)। এই কলাকৌশল শিল্পের পক্ষে কিছুই কৃত্রিম নয়, শিল্পের প্রকাশধর্মের ভিতরেই নিহিত আছে এই কলা-ধর্ম।

প্রকাশ-ধর্ম ই যদি শিল্পের প্রধান ধর্ম হয়, তবে শিল্প কখনও সমাজ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র ভাবে বিচার করিলে মনে হয়, ইহাই শিল্পের চরম কথা নহে, ইহা একটা স্তর-বিশেষের কথা মাত্র। শিল্পের ক্ষেত্রে 'এহো হয়' বা 'এহোত্তম', কিন্তু 'আগে কহ আর'। রবীন্দ্রনাথের শিল্পের আর একটি দিক আছে, সেখানেও হৃদয়-সংবাদ (Communication) রহিয়াছে, কিন্তু সে হৃদয়-সংবাদ মানুষের সঙ্গে নয়, তাহা তাঁহার অন্তর্যামী জীবন-দেবতার সঙ্গে। এখানেও শিল্পের প্রকাশ-ধর্ম রহিয়াছে, কিন্তু জবাবদিহি মানুষের কাছে নয়, জবাবদিহি জীবন-দেবতার কাছে। এই যে মানুষের মুখের দিকে না তাকাইয়া নিজের অন্তরতম সত্যস্বরূপের দিকে ফিরিয়া তাকান, রবীন্দ্রনাথের শিল্পের ক্ষেত্রে অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের ইহাই গভীর তাৎপর্য। ব্যক্তিকেন্দ্রে প্রতিভাত হইয়া যিনি রূপ গ্রহণ করিয়াছেন জীবন-দেবতার,

বিশ্বকেন্দ্রে তিনিই বিরাজিত বিশ্বদেবতা-রূপে। জীবনের এবং জগতের গভীরে মগ্ন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের দোসর হইলেন এই বিশ্বদেবতা। এই বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতি স্পষ্ট ধর্মমূলক কাব্যগ্রন্থের ভিতরেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই এই বিশ্বাসের স্ফুট এবং অস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতির অধ্যাত্ম সুর অতি স্পষ্ট বলিয়া এই কাব্যগ্রন্থগুলি যথাসম্ভব বাদ দিয়াই আমি রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসের কিছু কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। 'ছবি ও গান'-এর 'পূর্ণিমায়' কবিতাটিতে দেখিতে পাই কবি বলিতেছেন,—

হে ধরণী, পদতলে
দিয়ো না দিয়ো না বাধা
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও,
অনন্ত দিবস-নিশি
এমনি ডুবিতে থাকি
তোমরা সুদূরে চলে যাও।
এ কী রে উদার জ্যোৎস্না,
এ কী রে গভীর নিশি,
দিশে দিশে স্তব্ধতা বিস্তারি।
আঁখি দু'টি মুদে গেছে
কোথা আছি কোথা নামি
কিছু যেন বুঝিতে না পারি।

অসীমে সুনীলে শূন্যে
বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
তারে যেন দেখা নাহি যায়—
নিশীথের মাঝে শুধু
মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবিরে কোথায়।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের একটি 'মহান্ একাকিত্বে'র রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা শুধু ধর্ম-জগতের একাকিত্ব নয়; এখানে ধর্ম-জগৎ এবং শিল্প-জগৎ এক হইয়া যাওয়াতে, একের সত্য অন্যের নিয়ামক হইয়াছে। শিল্প-জগতে রূপের পূজারী রবীন্দ্রনাথের যে 'বিজন বাস' তাহার একটি গভীর অর্থ ফুটিয়া উঠিয়াছে 'মানসী'র 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায়।

আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে
একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস,
প্রলয় আসন জুড়িয়া বসিয়া
রব আমি বার মাস।

সকল সীমার ঊর্ধ্বে রূপের অতীতে অসীম রূপাতীতের যে ধ্যান, সেইখানেই কবির বিশ্বাতীত বিজন বাস। এই অসীম এবং রূপাতীত এই কবিতায় অবশ্য একটি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-মূর্তিতেই ধ্যেয়; কিন্তু এই সীমাহীন অথচ সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে

অধ্যাত্ম রহস্য লাভ করিয়াছে। সেই অধ্যাত্ম দৃষ্টি স্পষ্ট রূপ পাইয়াছে 'মানসী'র 'ধ্যান' কবিতায়, সেখানে—

বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ
হরণ করি।

* * *

উদয় শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত
একটি নয়ন সম ;
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিকো তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন ওই অসীম পাথার
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ-পূর্ণিমা।

'ক্ষণিকা'র 'সমাপ্তি' কবিতায়ও দেখি—

পথে যত দিন ছিনু, তত দিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানি না কখন পশিনু কেমনে।
অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে।

রবীন্দ্রনাথের মতে তাহা হইলে অনন্তের নিঃসীম রহস্যের মধ্যে অবগাহনই হইল 'একাকিত্বে'র তাৎপর্য। এখানে হৃদয়-সংবাদ সবটুকুই অসীমের সঙ্গে। এই একাকিত্বের রহস্য সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'র মধ্যে 'একাকী' কবিতাটিতে।

চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী,—
আপন নিঃশব্দগানে আপনারি শূন্য দিল ঢাকি'।
অয়ি একাকিনী,
অলিন্দে নিশীথ রাত্রে শুনিছ সে জ্যোৎস্নার রাগিণী
চেয়ে শূন্যপানে,
যে রাগিণী অসীমের উৎস হতে আনে
অনাদি বিরহ রস, তাই দিয়ে ভরিয়া আঁধার
কোন্ বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার।
তারি সাথে মিলায়েছ তব দৃষ্টিখানি,
চোখে অনির্বচনীয় বাণী,
মিলায়েছ যেন তব জন্মান্তর হতে নিয়ে-আসা
দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভাষা।
মিলায়েছ, সুগম্ভীর দুঃখের মাঝারে
যে-মুক্তি রয়েছে লীন স্তব্ধহীন শান্ত অন্ধকারে।

অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে
জনশূন্য তুষার শিখরে
কোন্ মহাশ্বেতা কোন্ তপস্বিনী বিছাল অঞ্চল,
স্তব্ধ অচঞ্চল,
অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে ঊর্ধ্বে তুলি' আঁখি,
"তুমিও একাকী।"

যিনি অনন্ত তিনি নিজে তাঁহার বিজন বাসে 'একাকী'; যেখানে তিনি সৃষ্টিকর্তা সেখানেও তিনি একাকী; সেই একাকীর ধ্যান হইতেই জাগে বিশ্বসৃষ্টি—আদি শিল্পীর শিল্পায়ন। মর্ত্যের সকল শিল্পী সেই আদি শিল্পীর নিকট হইতেই গ্রহণ করেন তাঁহার দীক্ষা; তাই তাঁহার ধ্যান-সমাহিত রূপেও তিনি একাকী—তাঁহার সৃষ্টিশালাতেও তিনি একাকী। এই একাকীর আহ্বান কবি যখন তাঁহার অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন, তখন—

জানিলাম একাকীর নাই ভয়
ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোন লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টি-কর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্য লোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
—(প্রান্তিক, ৩)

এই বিশ্বসৃষ্টি-রূপ বিরাট শিল্পকে রবীন্দ্রনাথ কখনও নটরাজের নৃত্য, কখনও কাব্য, কখনও সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এই নৃত্য, এই কাব্য, এই কবিতাকেই তিনি আবার নিজের মতন করিয়া গ্রহণ এবং প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। তাই—

কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন,
শুধু মোর আনমনে পথ চলা হল অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে। —(প্রণাম, পরিশেষ)

সৃষ্টির এই সঙ্গীতরূপটি এবং কবি সেই অনন্ত সঙ্গীতধারার কয়েকটি সুর নিজের বাঁশরীতে ভরিয়া কি ভাবে তাঁহার কবি-জীবনকে সার্থক করিতে চান, তাহার সুন্দরতম প্রকাশ দেখি 'সোনার তরী'র 'পুরস্কার' কবিতায়,—

অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্ব-নির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সংগীতে,
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা ;—
সেথা হ'তে টানি লব গীতধারা
ছোট এই বাঁশরীতে।*

* তুলনীয়— সর্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে।

অন্যত্র কবি বলিয়াছেন,—

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন-খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

* * *

যে নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়
কবির বাণী অবাক্ মানি
তা'রি নাচের প্রসাদ যাচে।

—(মুক্তি-তত্ত্ব, নটরাজ, ঋতুরঙ্গশালা)

এই নটরাজের বা বিশ্বকবির শিষ্যত্বের গর্ব কবিকে মানুষের মতামত সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, জবাবদিহি সেই একের কাছে, মানুষের কাছে নয়। মানুষের আজ্ঞা-অনুরোধ সবই উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু গুরুর আদেশ শিরোধার্য। তাই দেখি—

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ;
হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয় ;
"তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর, এ কী চপলতা।

আকাশে তারকা ফুটে, ফুলবনে ফুল,
খনিতে মাণিক থাকে, হয়নাকো ভুল—
তেমনি আপনি তুমি যেখানে যে গান
রেখেছ, কবিও যেন রাখে তার মান।

—(উৎসর্গ, সংযোজন, ৬)

কেন হাস্য পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে।"
দিয়েছি উত্তর তাঁরে, "ওগো পক্ককেশ,
আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ।
যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্তবেদনায়
ধ্বনিত মানবপ্রাণ, আমার বীণায়
দিয়েছেন তারি সুর—সে তাঁহারি দান,
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।
তব আজ্ঞা রক্ষা করি নাই সে ক্ষমতা,
সাধ্য নাই তাঁর আজ্ঞা করিতে অন্যথা।"
—(উৎসর্গ, সংযোজন, ৭)

কবিগুরুর 'কবিগুরু'ই যে শুধু সেই পরম এক ছিলেন তাহা নহে, কবির শ্রোতাও ছিলেন সেই 'এক', সমঝদারও তিনি।

জানি আমি মোর কাব্য ভালবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন দেওয়া নিধি।
* * * *
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁ'র আমার বাঁশিতে শুনিবারে।
—(সৃষ্টিকর্তা, পূরবী)

আবার,

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে

দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে ;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।
ওগো দূরবাসী,
কে শুনিতে চাও মোর চিরপ্রবাসের এই বাঁশি—
অকারণ বেদনার ভৈরবীর সুরে
চেনার সীমানা হতে দূরে
যার গান কক্ষচ্যুত তারা
চিররাত্রি আকাশেতে খুঁজিছে কিনারা।

—(দূরের গান, সানাই)

'রোগশয্যায়' বসিয়া কবি যে গান রচনা করিয়াছেন সে সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন,—

যখন বীণায় মোর আনমনা সুরে
গান বেঁধেছিনু বসি একা
তখনো যে ছিলে তুমি দূরে,
দাও নাই দেখা ;
কেমনে জানিব সেই গান
অপরিচয়ের তীরে তোমারেই করিছে সন্ধান।
দেখিলাম, কাছে তুমি আসিতে যেমনি
তোমার গতির তালে বাজে মোর এ ছন্দের ধ্বনি ;

মনে হল, সুরের সে মিলে
উচ্ছ্বসিল আনন্দের নিশ্বাস নিখিলে। (—৩৪)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই 'তুমি' কে? ইহাকে চিত্রা, বিচিত্রা, অন্তর্যামী, জীবনদেবতা বহু রূপেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভিতরে পাওয়া যায়। কাব্যের ভিতরে এই 'চির-অপরিচিতে'র কোন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, আছে শুধু আভাস ও ইঙ্গিত। তবু যদি দার্শনিক ভাষায় ইহাকে প্রকাশ করিতে হয় তবে বলিতে হয়, ইহা হইতেছে একটি অনাদি অনন্ত বিচিত্রলীলাময়ী সৃজনী-শক্তি। এই শক্তির লীলার একটি বিশেষ ছন্দ আছে: সেই ছন্দের এক দিকে আছে 'একে'র ভিতরে আত্ম-সংহরণ, অপর দিকে বহুর ভিতরে আত্ম-উৎসর্জন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বের্গসঁ-এর মধ্যেও আমরা বিশ্বনিখিলের অন্তর্নিহিত একটি সৃজনী-শক্তিতে বিশ্বাস দেখিতে পাই, তিনিও সেই শক্তিকে বলিয়াছেন প্রাণ-শক্তি। কিন্তু এ-শক্তিও জড়শক্তি; রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি একটি নিত্যবিবর্তনশীল চিৎশক্তি; এই চিৎশক্তি কবির মনের গভীরে ঔপনিষদিক 'একে'র সহিত মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মবোধ এবং তজ্জাত না হইলেও তৎসহচর বহির্বিমুখতা এবং আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ রবীন্দ্রনাথের শিল্প-জীবনে একেবারে তরঙ্গহীন একটানা পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। প্রথম জীবনে অন্ততঃ তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সমাজবোধের ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব ছিল; কিন্তু তার পরে মনে হয়, শিল্পের ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্যবোধে তাঁহার যেন একটা অচলপ্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিল। এই আত্মতন্ত্রের এবং সমাজতন্ত্রের ভিতরে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব স্পষ্ট রূপ

লাভ করিয়াছে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়। এখানে দেখিতে পাই, কবির নিজের এই স্বাতন্ত্র্য এবং পলাতকা-বৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ। এই কবিতার প্রথম অংশে রহিয়াছে একটি বলিষ্ঠ সমাজবোধের পরিচয়। এই সমাজবোধ কবিকে সমীরে সমীরে না ছুলিয়া এবং কোন মোহিনী মায়ায় না ভুলিয়া, বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায় অলস-ঔদাস্যে না বসিয়া থাকিয়া 'ধূসর প্রসর রাজপথে' বাহির হইয়া আসিবার প্রেরণা দিয়াছিল। এখানে আর কবি কর্মহীন অলস জীবন বরণ করিয়া লইতে চান নাই, পরন্তু অতি স্পষ্টাক্ষরেই কবি-জীবনের একটি সামাজিক করণীয় নির্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। এখানে কবি আর 'মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে' সংসারসীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে চান নাই; এখানে স্পষ্ট বলিয়াছেন—

সে বাঁশিতে লিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্তে পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি',—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

কিন্তু এই ঘাটে রবীন্দ্রনাথ বেশিক্ষণ সুর রাখিতে পারেন নাই; সহজাত অধ্যাত্মপ্রবণতা তাঁহার মনের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সুরের মোড় ফিরাইয়া দিতে লাগিল, তীব্র-সমাজবোধ ধীরে ধীরে মোড় ফিরিয়া

স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে যেমন বিদ্রোহীর বলিষ্ঠ সুরে নিজেকে কঠিন কর্মে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,

কবি, তবে উঠে এসো, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।—

পরে আর সে সুর রহিল না, বৃহতের অস্পষ্ট আবরণে সে ক্রম-বিলীয়মান। কবির কর্তব্যকে সম্মুখের দুঃখ-ব্যথাভরা, দরিদ্র, ক্ষুদ্র, অন্ধকার কষ্টের সংসার হইতে ছাড়াইয়া লইয়া কবি তাহাকে যখন বৃহৎ-জীবনের নাম-না-জানা আদর্শের পশ্চাতে অভিসারে পাঠাইলেন, তখন এই বদ্ধ অন্ধকার কষ্টের সংসারের হাত হইতে কবিও আস্তে আস্তে নিষ্কৃতি পাইতে লাগিলেন। আদর্শের এই কঠিন-পথ—ধন-মান-প্রাণ সঁপিয়া, সর্বস্ব দানে যেখানে হোম-হুতাশন জ্বালিতে হয়—হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া যেখানে শেষ আহুতি দিতে হয়, তাহাই আবার একটু একটু করিয়া 'নিরুপমা সৌন্দর্য প্রতিমা'র রূপ ধারণ করিল এবং পর-মুহূর্তেই দেখা দিল 'বিশ্ব-প্রিয়া'র রূপে। শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই, সেই অজ্ঞাত 'একে'র ভিতরে গিয়াই জীবনের সব সার্থকতা—'তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব প্রেমতৃষা।' এই কারণেই সমাজবোধ রবীন্দ্রনাথের নিকট কোন দিনই খুব তীব্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। সমাজবোধ যাঁহাদের খুব তীব্র—শুধু তীব্র

নয়—সমাজবোধকেই যাঁহারা পরম শ্রেয়োবোধ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে সমাজই যে পরম সত্য—'তাহার উপরে নাই'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজবোধ সেই অধ্যাত্ম 'একে'র যে বোধ তাহার অঙ্গীভূত হইয়া থাকায় কখনও রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে সর্বস্ব-আহুতির দাবী জানাইতে পারে নাই। তাই বলিয়া আমি রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধের ভিতরে সমাজবোধের একান্ত অপ্রাচুর্যের কথা বলিতেছি না। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁহার সমাজবোধের পরিচয় অপ্রচুর না হইলেও অস্পষ্ট; অবশ্য কোন অধ্যাত্মবোধের সহিত যুক্ত না হইয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত জীবন অবলম্বন করিয়া রচিত কবিতাও রবীন্দ্রনাথের কম নহে। কবিতার ক্ষেত্রে এই সমাজবোধকে দুর্বল বা অস্পষ্ট স্বীকার করিলেও রবীন্দ্রনাথের এতগুলি উপন্যাস, ছোট গল্প এবং বিবিধ রকমের গদ্য লেখাকে অবহেলা করিলে চলিবে না, এবং ইহার ভিতরে রবীন্দ্রনাথের যে সমাজ-চেতনার পরিচয় আছে, অন্ততঃ বাঙলা দেশে তাহা বিরল। তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের সমাজবোধ তীব্র নয় এ-কথা বলিবার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই যে, এই সমাজ-চেতনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবটুকু শ্রদ্ধা বা চরম শ্রদ্ধা আদায় করিয়া লইতে পারে নাই।

'এবার ফিরাও মোরে' সম্বন্ধে এক দল পাঠক-সমাজে একটা বিশ্বাস আছে যে উহা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে একান্তই একটা সাময়িক আলোড়ন, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে ইহার কোন গভীর স্থান নাই—এ আলোড়নটা অনেকখানি নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের একটা আকস্মিক বিস্ফোরণের মতন। কথাটা সত্য নহে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে যে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই, অনেক পূর্ব হইতেই এই দ্বন্দ্ব তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কবি-মনের ভিতরে আশৈশব যে একটা রোম্যান্টিক্ বিষাদ ছিল—এবং কেবলই যে

"লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস"—

'প্রভাত-সঙ্গীতে'র ভিতরেই ইহার বিরুদ্ধে কবি-মনের একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ প্রতিক্রিয়া একটা ব্যাধিত (morbid) আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে বৃহৎ বহির্জগতে আত্ম-প্রসারের জন্য—ইহার প্রয়োজন ছিল মুক্ত আলো-হাওয়ায় কবি-মনের স্বাস্থ্যের জন্যই। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র অনেক কবিতার ভিতরে এই আত্ম-প্রসারের তাগিদের সহিত সমাজ-চেতনারও পরিচয় মেলে। এই জাতীয় একটি চমৎকার কবিতা 'স্বপ্নরুদ্ধ' আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। কৈশোর প্রেমের মদির স্বপ্নবিলাসে বদ্ধ কবি বলিয়াছিলেন,—

কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন।
দেখ ওই দূর হ'তে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ-শিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।
চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ-দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার-সংশয় রাত্রি রহিব নির্ভয়। —(মরীচিকা)

ইহা শুধু কৈশোর প্রেমের মদির বিহ্বলতা হইতে বাহিরে আসিবার

আকাঙ্ক্ষা নয়, ইহা মদির কাব্য-বিলাস হইতে একটি সবল কাব্যধর্মে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা। তখন পর্যন্ত সমাজচেতনার ভিতরেই কবি মুক্তির সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন। কবি অনুভব করিয়াছিলেন, তখন পর্যন্ত যে তাঁহার 'গান রচনা' তাহা—

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন ;
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনার ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ করে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।

—(গান রচনা)

এ জাতীয় জীবন কবির নিজের নিকটেই অভিশপ্ত বলিয়া মনে হইয়াছে, এই অতৃপ্ত আত্মরতির আকাঙ্ক্ষাকে নিজেরই 'প্রেতের পিপাসা' বলিয়া লাগিয়াছে। এ যেন—

দু'টি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা।
মানব-জীবন যেন সকলি নিষ্ফল,
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।

* * *

কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়,
কোথারে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময়॥ —(অক্ষমতা)

ইহার পরের কবিতাই হইল 'জাগিবার চেষ্টা'—

স্বপ্নের সমাধি মাঝে বাঁচিয়া কী হবে,
যুঝিতেছি জাগিবারে,—আঁখি রুদ্ধ হায়।

*　　　*　　　*

মোর বলে কাহারেও দেব না কি বল,
মোর প্রাণে পাবে না কি কেহ নবপ্রাণ।
করুণা কি শুধু ফেলে নয়নের জল,
প্রেম কি ঘরের কোণে গাহে শুধু গান?
তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ
যদি মা করিতে পারি কারো কোনো কাজ।

নিজের বহির্বিমুখ দুর্বল আত্মকেন্দ্রিকতাকে ধিক্কার দিয়া কবি নিজেই বলিয়াছেন—

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা।
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না শরমে।
খাঁচার পাখির মতো গান গেয়ে মরা,
এই কি মা আদি অন্ত মানব-জনমে।

*　　　*　　　*

কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে করো গো আহ্বান,
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল,
দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান।
তার পরে একসাথে এস কাজ করি,
কেবলি বিলাপ-গান দূরে পরিহরি॥

—(কবির অহংকার)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ভবিষ্যতে কোন্ কবিধর্মে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইবেন এই 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রশ্নটি নানা ভাবে জাগিয়াছিল এবং বৃহত্তর মানব-সমাজের সহিত সক্রিয় ঐকাত্ম্যের মধ্যে কবি তাঁহার কাব্য-সাধনার প্রতিষ্ঠা খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু এই পথে কবির আর চলা হয় নাই; ধীরে ধীরে মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছেন জীবনদেবতা, এই সংসারের পথ হইতে কবিকে তিনি ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছেন অন্য পথে। এই অন্য পথে আসিয়াও বিশ্বজীবনের সহিত কবি-জীবনের নিবিড় যোগ রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে যোগসূত্র সেই পরম এক। সংসার স্ব-মহিমায় তাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে কম, মহিমা তাহার অনন্তের পরিচয়-লিপিতে,—অসীমের আভাসে। সৌন্দর্যের সংজ্ঞাই তাই রবীন্দ্রনাথের মতে শুধু অনন্তের আভাস—প্রকৃতির ক্ষেত্রেও মানুষের ক্ষেত্রেও। 'সোনার তরী'তে উঠিয়াও কবি মাঝে মাঝে এই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সহিত অখণ্ডযোগ রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন—

চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী সাথে একগতি মোর।

—(গতি)

অথবা, বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে ?

—(মুক্তি)

কিন্তু এই বিশ্বকে—নিখিল মানব-সমাজকে তিনি একান্ত জড়বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া বিশ্বের ভিতর দিয়া এক বিশ্বাতীতই তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছিল; তখন সকলের ভিতরেই তিনি অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বিশ্বাতীতের মহিমা।

এই সব কারণে রবীন্দ্রনাথ শিল্পের সাংসারিক প্রয়োজনের দিক্‌টাকে যতটা পারেন অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে স্বীকার করিয়াছেন সেখানেও বড় জোর সেই—'গীতরস-ধারা করি সিঞ্চন সংসার-ধূলিজালে'—এই পর্যন্ত—ইহার বেশী নয়। এখানে মার্ক্স্‌পন্থিগণের সহিত যেটা পার্থক্য সেটা জীবনের মূল শ্রেয়োবোধেরই পার্থক্য। মার্ক্স্‌পন্থিগণ শিল্পকে শুধু প্রয়োজনের বলেন নাই, তাঁহাদের মতে আসল শিল্প তাহাই যাহা একটি বিশেষ দলের হাতে শাণিত অস্ত্র। তাঁহাদের শ্রেয়োবোধ সম্পূর্ণরূপে জাগতিক বিপ্লবের পথে—যে বিপ্লব মানুষের জীবন হইতে দূর করিয়া দিবে সর্বপ্রকারের অসাম্যের পাপ,—মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিবে শ্রেণীহীন সমাজে। ইহাকে যদি মানুষের পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে এ-কথাও স্বীকার করিতে হয়,—তাহাই খাঁটি শিল্প যাহা বহন করে বিশ্বাতীতের আভাস নয়, বিপ্লবের বহ্নি, এবং তাহার ভিতর দিয়া শ্রেণীহীন নবজীবনের সূচনা। যে কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই কথা বলিয়াই তাই শেষ করিতে হয়,—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের যা বিরোধ তাহা শিল্পবোধের বিরোধ নয়—জীবনবোধের, শ্রেয়োবোধের বিরোধ।

যুগধর্ম ও যুগশিল্প

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন তাহার বিশ্বগ্রাসী পরিণতি লাভ করিল, তখন আমরা দেখিতে পাইলাম, সমস্ত পৃথিবীটা মোটামুটি-ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দুইটি ভাগের একটি ভাগ হইল ফ্যাসিস্ট, অপরটি হইল ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক। ইহার ভিতরে চরম মজার কথা হইল এই, ঘটনাচক্রে আমরা পৃথিবীর গণতন্ত্রের কর্ণধাররূপে দেখা পাইলাম শ্রীযুক্ত চার্চিল সাহেবের। কিন্তু ফ্যাসিবাদের পতনের পরে শ্রীযুক্ত চার্চিল যখন প্রথম দিন বিজয়-ভাষণ দান করিলেন, সেই দিনই তাঁহার কণ্ঠে অতি স্বাভাবিক দম্ভের সুরে বাহির হইয়া আসিল বিশ্ববাসীর নিকটে গূঢ়বাণী—"রুল্ ব্রিটানিয়া রুল্ দি ওয়েভ্‌স্"। কিন্তু এই চার্চিল সাহেবকেও কিছুদিন বিশ্বের দরবারে গণতন্ত্রের গান করিয়া আসর বেশ জমাইয়া রাখিতে হইয়াছে। জিনিসটিকে একটা নির্জলা ভণ্ডামি বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না! চার্চিলকেও যে একদিন বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের কথা বলিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইয়াছিল তাহার ভিতর দিয়া সত্যকার চার্চিল-ধর্ম কিছু প্রকাশ না পাক্, একটা বিরাট যুগধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। যে যুগধর্ম মানুষের জীবনাদর্শকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, তাহার জয়-গান করিতেই হইয়াছে।

এমনি করিয়াই যুগধর্ম আমাদের নিকট হইতে তাহার জয়গান আদায় করিয়া লয়, আমরা কণ্ঠে সে জয়গানকে স্বীকার করি, কিন্তু

মুখে হয়ত সব সময় স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করি না। যুগধর্ম এইভাবে আমাদের সমগ্র জীবনের অন্তর্যামিরূপে দেখা দেয় বলিয়া সে আমাদের সকল শিল্প-সৃষ্টিরও অন্তর্যামী।

এই যুগধর্ম কথাটা আজকাল বড় বেশী ব্যবহৃত হইতেছে, আর কথাটা যতই বেশী করিয়া ব্যবহৃত হইতেছে একদল লোক ততই কথাটার উপরে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বলিবেন, মানিতে হয় ত এক ধর্মকে মানিব—যে ধর্ম অচল অটল—শাশ্বত; মাঝখানে আবার স্থানে অস্থানে কথায় কথায় এই একটা যুগধর্মের উৎপাত সৃষ্টি করা হইতেছে কেন?

করা হইতেছে এই জন্য যে, আসলে ধর্ম জিনিসটাই কোথাও অচল এবং শাশ্বত হইয়া বসিয়া নাই। ধর্মের ভিতরে এই যে একটা নিরন্তর হইয়া উঠিবার প্রশ্ন রহিয়াছে, ধর্মের এই গতিশীল রূপটির উপরে জোর দিবার জন্যই আজকাল যুগধর্ম কথাটাকে বারবার করিয়া সর্বপ্রসঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়।

যুগধর্ম কথাটা যে অনেক সময় আমাদের নিকট বিরক্তিকর হইয়া দেখা দেয়, তাহার কারণ, যুগধর্ম কথাটার একটা তরল অর্থ আছে এবং এই তরল অর্থেই কথাটিকে গ্রহণ করিতে আমরা অভ্যস্ত। বাঙলাদেশে অকস্মাৎ একটি সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষকে অবলম্বন করিয়া বাঙলাদেশের কাব্যকুঞ্জের কবিগণ সমস্বরে 'ফেন চাই, ফেন চাই' করিয়া মুখর হইয়া উঠিলেন, শিল্পীরা ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন—ভোজমত্ত লাট-সাহেবের বাড়ির পাশে ডাস্টবিনের পাশে বসিয়া ছেঁড়া রুটির টুকরা এবং সর্বচুষিত মাংসের হাড় লইয়া মানুষে ও কুকুরে সমানে কামড়া-কামড়ি চলিতেছে। এই দুর্ভিক্ষ বাঙলাদেশে কিছু চিরন্তন নহে, আবার

আমাদের ঘরে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিতে পারে; তখন যে আবার ডাস্টবিনের ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প, কবিতা, চিত্রকে ঝুড়িতে ঝুড়িতে করিয়াই ডাস্টবিনে ফেলিয়া দিয়া আসিতে হইবে। শিল্পের ক্ষেত্রে এই যুগধর্মকে লইয়া এত গলাবাজি বা আস্ফালন করিয়া লাভ কি?

উপরে যে যুগধর্মের কথা বলা হইল, আসলে ইহাই কিন্তু যুগধর্ম নহে। একটা জাতির জীবনে যখন যে সাময়িক আলোড়ন দেখা দেয় তাহাই তাহার জীবনে একটা যুগধর্মকে বহন করিয়া আনে না। যুগধর্ম কথাটির আর একটি গভীরতর তাৎপর্য রহিয়াছে; তাহার সেই রূপটি অনুভব করিতে না পারিলে আমরা সমুদ্রতীরে বসিয়া বাত্যা-বিক্ষুব্ধ প্রতিটি তরঙ্গে শুধু এদিকে-ওদিকে দোল খাইয়াই মরিলাম, যথার্থ 'স্রোতাপন্ন' হইয়া যুগধর্মকে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

আর একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটিকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। এক এবং অবিভাজ্য বাঙলাদেশকে জোর করিয়া দুইভাগ করিয়া মোটামুটিভাবে হিন্দু-মুসলমানের ভিতরে তাহাকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বঙ্গভঙ্গের পূর্বে ও পশ্চাতে দেখা দিয়াছে হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, লুটতরাজ, বেইজ্জতি—সর্বপ্রকারের পাপাচার; ফল হইয়াছে অগণিত নরনারীর পক্ষে সর্বনাশা বিপর্যয়—বিপর্যয় ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, আর্থিক জীবনে—শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে। এই যে সর্বনাশা বিপর্যয় ইহাকেও দেখিবার—গ্রহণ করিবার—দুইটি দিক্ রহিয়াছে। একদিক্ হইতে বলা যায়, বাঙলাদেশে বিশেষ একটি যুগে একদল সাম্রাজ্যবাদী এবং আর একদল স্বার্থান্বেষীর যৌথ চক্রান্তে একটা সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী মত্ততা দেখা দিয়াছিল; সেই মত্ততার হানাহানিতে ধনেপ্রাণে জাহান্নমে গিয়াছে উভয় সম্প্রদায়ই। এই দৃষ্টিতে সব জিনিসটিকে দেখা নিতান্তই একটা

অগভীর সাময়িক দৃষ্টিতে দেখা। এই সাময়িক আলোড়ন কোনও যুগধর্মকে বহন করিতেছে না; সুতরাং এই দৃষ্টিতে বাঙলাদেশের জাতীয় জীবনকে দেখিয়া যিনি তাহাকে সাহিত্যে বা অন্য শিল্পে রূপ দিবার চেষ্টা করিবেন, তিনি ঠুনকো সাময়িক শিল্পই সৃষ্টি করিবেন; ইহা দ্বারা যুগধর্ম এবং সেই যুগধর্ম-প্রণোদিত শিল্প-সৃষ্টির বিচার চলে না।

কিন্তু বাঙলাদেশের এই যে বিশেষ যুগের একটি বিশেষ আলোড়ন ইহাকে দেখিবার এবং গ্রহণ করিবার আর একটি গভীর দৃষ্টি রহিয়াছে; সেই দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, এই আলোড়ন এবং বিপর্যয়ের সহিত মহাকালের চক্রের যে নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন তাহার একটি গভীর যোগ রহিয়াছে। একটা ধর্মের আবরণ-মাত্রকে অবলম্বন করিয়া একটা জাতির জীবনে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থা—সর্ববিধ ব্যবস্থাতেই একটা গভীর অসাম্য কালের রথচক্রের সাবলীল গতি ব্যাহত করিতেছিল, জাতির অগ্রগতির পথে বহুদিনের পুঞ্জীভূত এই বাধা-জঞ্জালকে ভাঙিয়া পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং জাতীয় জীবনের এই আলোড়ন-বিপর্যয়ের শুধু ধ্বংসাত্মক রূপই নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন সৃষ্টিগর্ভ একটা বিপ্লবাত্মক রূপও আছে। এই রূপটি বহন করে যুগধর্মকে। এইরূপে ইহা জাতীয় জীবনের ক্রম-বিবর্তন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া জাতীয় জীবনের ইতিহাসে নেহাৎই একটা আকস্মিক খাপছাড়া বস্তু হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ জাতীয় ইতিহাসের যে জটিল-কুটিল স্রোতোধারা তাহাই এই ধর্মকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে।

যুগধর্ম তাহা হইলে বলিব কাহাকে? আমাদের সমগ্র সমাজ-জীবনের অন্তস্তলে যত শক্তির আলোড়ন-বিলোড়ন রহিয়াছে তাহার

ভিতর দিয়া একটা ধর্ম আমাদের সমাজ-জীবনে নিরন্তর হইয়া উঠিতেছে। এই ধর্ম শাশ্বত এই অর্থে যে তাহার এই নিরন্তর হইয়া ওঠার ভিতরে একটা একাগ্রতা এবং অখণ্ডতা রহিয়াছে। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আজ এ-কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহার যে প্রবাহ তাহা জড় অন্ধই হোক্, অথবা তাহার পশ্চাতে চৈতন্যের দোলাই থাকুক্, তাহা কোথাও খাপছাড়া এলোমেলো নহে ; সে যখন যতটুকু হইয়া উঠিয়াছে সেই সবটুকু হওয়াই মিলিয়া-মিশিয়া একটা অখণ্ডতা লাভ করিয়াছে এবং তাহার এই সমগ্র অখণ্ডতা জুড়িয়া রহিয়াছে 'একে'র সাধনা। এই একত্ব এবং অখণ্ডত্বই হইল আমাদের ক্রমবিকশিত ধর্মের শাশ্বতত্ব। কাল-প্রবাহের প্রত্যেক অংশের ভিতর দিয়াই এই ধর্ম একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করিতেছে ; এই ক্রমপরিণতিটি একটি কাল-সীমানায় আসিয়া যখন বিশেষ হইয়া ওঠে—তখন তাহাকেই আমরা বলিব যুগধর্ম। যুগধর্ম তাই আমাদের শাশ্বত ধর্মের কখনও বিরোধী হইয়া উঠিতে পারে না ; যত বড় বিপর্যয়কেই সে বহন করিয়া আসুক্, সে কখনই সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক হইয়া ওঠে না ; সকল বিরোধ-বিদ্রোহ-বিপ্লবের ভিতর দিয়াও সে ডাকিয়া বলে, I am come not to destroy, but to fulfil, আমি কিছুই ভাঙিতে আসি নাই, সকলই পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। পূর্ণ করিবার পূর্বে যেটুকু জঞ্জাল পোড়াইয়া লইবার তাহাই সে পোড়াইয়া লয়, সেই অগ্নিভস্মের ভিতর হইতে দ্যুতিমান্ স্বর্ণকান্তি নূতন বাহির হইয়া আসে। এই নূতন পুরাতনের একটা অস্বীকার মাত্র নহে, পুরাতনের সকল ক্রমাভিব্যক্তির ভিতর হইতেই তাহার এই নূতন অভিব্যক্তি—সে পুরাতনেরই ক্রমপরিপূর্ণতা। আমরা প্রচলিত অর্থে যাহাকে 'সাময়িকতা' বলি, যুগধর্ম হইল সম্পূর্ণ তাহার বিরুদ্ধ বস্তু।

এই যুগধর্ম ই দেখা দেয় আমাদের অন্তর্যামিরূপে—বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রেও—আমাদের সকল শিল্পের ক্ষেত্রেও।

সুতরাং এই যুগধর্মকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা হইল সমস্ত সমাজ-জীবনের আবর্তন-বিবর্তনের ভিতর দিয়া আমাদের যে হইয়া উঠিবার সাধনা সেই সাধনা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা। শিল্পের ক্ষেত্রে সার্থকশিল্পী মাত্রই জ্ঞাতে হোক্—অজ্ঞাতে হোক্—এই যুগধর্মকে গ্রহণ করেনই; কিন্তু মুখে আমরা সচরাচর সেই কথাটাকে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহি না। স্বীকার করিতে বেশী করিয়া নারাজ তাত্ত্বিক সমালোচকের দল, শিল্পের ক্ষেত্রেও ন্যায়-বিলাসী ব্যাখ্যাতা-গবেষকের দল। যুগধর্মের প্রতিফলন আমাদের বুদ্ধির উপরে সর্বদা স্পষ্টও নয়, বিশুদ্ধও নয়, ইহার স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ প্রতিফলন আমাদের বিশুদ্ধ-শিল্প-বাসনার উপরে।

বিশুদ্ধ-শিল্প-বাসনা কথাটির আবার একটি ব্যাখ্যা থাকার প্রয়োজন মনে করি; কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধি কথাটার আবার একটা প্রায় পারিভাষিক অর্থ প্রচলিত আছে। শিল্পের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সেই প্রচলিত বিশ্বাস বা মতবাদটা এই যে, ইহা নিজের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য আমাদের অন্যপ্রকারের সকল বাসনার স্পর্শ দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া দিয়া একটা পরম-স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়া একক হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পের এই পরম-স্বাতন্ত্র্যের মতবাদটাকে যে কোন দিক্ দিয়াই গ্রহণ করা যায় না প্রসঙ্গান্তরে পূর্বে আমি বহুবার বহুভাবে ইহার আলোচনা করিয়াছি। শিল্প-বাসনার বিশুদ্ধি বলিতে আমি বলিতে চাই সেই শিল্প-বাসনার কথা, যাহা আমাদের বুদ্ধিদত্ত বাদ-বিসংবাদকে যথাসম্ভব দূরে সরাইয়া রাখিয়া আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির উপরেই অধিক প্রতিষ্ঠিত। মানুষের পরিমার্জিত বুদ্ধি

অপেক্ষা মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তি তাহার সত্যকারের পরিচয়কে অনেক বেশী পরিমাণে বহন করে; আর সহজ প্রবৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বাসনার আমাদের জীবন-বাসনার সহিত যোগও নিবিড়তর।

এই বিশুদ্ধ-শিল্প-বাসনার সন্ধান পাওয়া যায় যথার্থ শিল্পিগণের ভিতরে, শিল্প-তত্ত্বজ্ঞ বা শিল্প-ব্যাখ্যাতৃগণের তর্কবুদ্ধির মধ্যে নহে। শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির ভিতর দিয়া আমরা অনেক সময় এমন কতগুলি কথা, যুক্তি-তর্ক, এমন কতগুলি মতবাদ লাভ করি, যেগুলি আমাদের সমগ্র জীবনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিলাইয়া লওয়া যায় কিনা এ প্রশ্নটাও আমরা সব সময় খতাইয়া দেখি না। ফলে হয়ত এমন কতগুলি 'উচিত' আসিয়া আমাদের সর্বোচ্চস্থিত মস্তকটি জুড়িয়া বসে যাহাদের সহিত নিম্নস্থ হৃদয়টির কোনও সহজ বনিবনা নাই।

আধুনিক কালেও আমরা দেখিতে পাই, যুগধর্ম বা যুগধর্ম-নিয়ন্ত্রিত যুগশিল্প প্রভৃতি কথাগুলি শিল্পতত্ত্বজ্ঞগণের মোটেই মনঃপূত নহে; তাঁহারা হাসিয়া বলিবেন, সাহিত্য বা সাধারণ-শিল্পের আজও যাহা সত্য, কালও তাহাই সত্য; যাহা ভাল তাহা নিত্যকালেরই ভাল। কিন্তু কথাটা বোধহয় সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাহার প্রমাণ সর্বাপেক্ষা ভাল হইল এই—যিনি শিল্প-ব্যাখ্যাতা তাঁহাকে একজন শিল্প-নির্মাতা হইতে দিন; দেখিবেন তিনি মুখে যাহা বলেন হাতে ঠিক তাহা করিবেন না। আমাদের ভিতরে কাহারও কাহারও ধারণা রহিয়াছে, শাশ্বত সাহিত্যের যাহা সত্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে বাঙলা-সাহিত্যে তাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; কিন্তু ইঁহাদিগকে বিধাতা যদি সত্যকারের ঔপন্যাসিকের প্রতিভা দিতেন, দেখিতে পাইতাম ইঁহারা কিছুতেই ঠিক আর বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় উপন্যাস লিখিতেন না; শুধু যে

রূপের পার্থক্য হইত তাহা নহে, প্রাণবস্তুরও পার্থক্য হইত। আমাদের কাহারও হয়ত কোনও এক বিশেষ যুগের একজন বিশেষ কবিকে ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু দেখা যাইবে তিনি যখন কবিতা লিখিবেন তখন তাঁহার আদর্শ কবির অনুরূপই কবিতা লিখিবেন এ-কথা সত্য নহে। সেক্স্‌পিয়ার যত ভাল নাটকই লিখুন, ইংরেজি-সাহিত্যে সেক্সপিয়ারের যথার্থ আবির্ভাব একবারই ঘটিয়াছে; আমাদের রবীন্দ্রনাথও যত ভাল কবিতাই লিখুন, আর ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁহার অন্ধ অনুকরণ যতই হোক্ না কেন, বাঙলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সার্থক আবির্ভাব একবার বই দুইবার ঘটিবে না।

শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রাচীনধারার পুনরুজ্জীবন (Revivalism) বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। এই জিনিসটিই একবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যাক্। সাহিত্য অপেক্ষাও চিত্রশিল্পে এই প্রাচীনধারার পুনরুজ্জীবন প্রথাটা অনেক বেশী। এই পুনরুজ্জীবিত শিল্পকে একটু ভাল করিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন, আমার বিশ্বাস, সর্বত্রই দেখিতে পাইবেন, এই পুনরুজ্জীবনের ভিতরেও শিল্প শুধু নূতন দেহ নয়, প্রাণও নূতন করিয়া লাভ করে।

শিল্পাদর্শের সর্বজনীনতা এবং সর্বকালীনতা সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক সময় একটা কথা বলিয়া থাকি। আমরা বলি, কই, এত যে যুগধর্ম, যুগাদর্শের কথা শুনি, আজকে এই বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে বসিয়া বাল্মীকি, কালিদাস, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ, হোমার্, সেক্স্‌পিয়ার, মিল্টন্, ব্রাউনিং সকলকেই ত বেশ এক নিঃশ্বাসেই গ্রহণ করিতে পারিতেছি; তাঁহাদের কাব্যাদি আস্বাদনে কোথাও ত তেমন কিছু প্রকাণ্ড বিঘ্ন ঘটিতেছে না! কিন্তু সেক্ষেত্রে বিঘ্ন ত ঘটিবারও

কথা নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, নূতন যে সে ত ঠিক পুরাতন যাহা কিছু সকলের একটি মূর্তিমান্ অস্বীকার নহে; পুরাতন যাহা কিছু তাহা অকাতরে দুইহাতে গ্রহণ করিয়াও সে নূতন। শিল্পের ক্ষেত্রেও আমরা পুরাতন সকলকে গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু গ্রহণ করিয়াও আমরা নূতন, সে নূতনত্বের পরিচয় ধরা পড়ে আমরা নিজেরাই যেখানে শিল্পী হইয়া উঠি। কালিদাসকে আধুনিক কালে একজন পাঠকের খুবই ভাল লাগিতে কোনও বাধা নাই; কিন্তু কালিদাসকে এমনভাবে খুব ভাল লাগে যাঁহার তাঁহারও কখনও 'রঘুবংশে'র ন্যায় একখানি কাব্য—এমনকি ঠিক 'শকুন্তলা'র ন্যায় আর একখানি নাটক লিখিতে ইচ্ছা হইবে বলিয়া মনে হয় না। যদি সে ইচ্ছা হয়ও তবে তাহার ফল খুব ভাল হইবে বলিয়া আশা করিতে পারি না। কালিদাসের 'মেঘদূতে'র অনুকরণে রচিত দূত-কাব্য সংস্কৃতে আরও অনেক হইয়াছে, কিন্তু দুধের স্বাদ কোথাও ঘোলে মিটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কালিদাসের মেঘদূত একক এবং অদ্বিতীয়ই রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপরে কালিদাসের প্রভাবের কথা কাহারও অজানা নাই; কিন্তু এ-প্রভাব যেখানে প্রত্যক্ষও হইয়া উঠিয়াছে সেখানেও দেখিতে পাই, কালিদাস কালিদাস, আর রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ।

এই যুগধর্মকে স্বীকার করিতে হয় বলিয়া আমাদিগকে যুগ-শিল্পকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এটা একটা ভুঁইফোঁড় কোন জিনিস নহে, সমস্ত প্রাচীনের পটভূমিকায়—সকল প্রাচীন ধর্ম স্বীকার করিয়াই তাহার ভিতর হইতে একটি নূতনের অভিব্যক্তি। আমাদের বর্তমান যুগ-শিল্পের বৈশিষ্ট্যকেও তাই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

কিছু দিন পূর্বে একজন প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পীর ভবিষ্যৎ কর্মাভিলাষের কথা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, তাঁহার এখন আর বড় বড় শহরের বড় বড় প্রেক্ষাগৃহগুলিতে নাগরিক অভিজাত দর্শক সম্প্রদায়ের সম্মুখে নৃত্য দেখাইতে ইচ্ছা করে না; তিনি এখন চান উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা মাঠ-ঘাঠ, পল্লীর প্রান্তর-প্রাঙ্গণ—যেখানে পাঁচ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দরে টিকিট কিনিয়া নির্বাচিত সৌখিন সমাজ আসন সংরক্ষণ করিতে পারে না—যেখানে হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে দর্শক অনায়াসে বিনা কপর্দকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিড় করিয়া থাকিতে পারে। কেহ হয়ত কথাগুলিতে অবিশ্বাস করিবেন, বলিবেন, বাস্তবে দেখুন গিয়া, তিনি তাঁহার টিকিটের হার পাঁচ হইতে পঞ্চাশের স্থলে এখন দশ হইতে এক শ' করিয়া লইয়াছেন; অতএব, সর্বৈব বাক্যাড়ম্বর! তাহাই যদি সত্য হয়—অর্থাৎ, শিল্পক্ষেত্রে ইনিও যদি একজন ক্ষুদে-চার্চিল হন, তাহা হইলেও অন্ততঃ এই কথাটাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, যুগের হাওয়ায় নূতন একটি ধর্ম ভাসিয়া বেড়াইতেছে, যাহা সকলজাতীয় শিল্পীর মুখেই একটা নূতন কথা দিতেছে।

একজন নৃত্যশিল্পীর সাম্প্রতিক শিল্প-বাসনা সম্বন্ধে উপরে যে-কথাগুলি বলা হইয়াছে, একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে ক্রমোন্মেষশালী একটি গভীর সমাজ-চেতনা এবং এই গভীর সমাজ-চেতনাই যেন আজকের দিনের সর্বপ্রকারের শিল্পের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। ব্যক্তি—সে যত বড়ই হোক্ না কেন—শুধুমাত্র ব্যক্তির ভিতরেই তাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া মন যেন কিছুতেই খুশী হইতে পারিতেছে না; তাহাকে একটা বৃহৎ জনসমাজের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া লইতে না পারিলে যেন তাহার কোন মহিমা

অনুভব করিতে পারি না। এইজন্য আধুনিক মনের একটি বিশেষ ঝোঁক হইল অতীতের বড় বড় ব্যক্তিগণের সহিত যতটা পারা যায় তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জনসমাজকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি সকল শ্রেষ্ঠমানবকেই আজ তাই আমরা এই বিশেষ দৃষ্টি লইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। এই দৃষ্টির ফলে আমাদের নিকটে অতীতের ইতিহাসের রূপও খানিকটা খানিকটা বদলাইয়া যাইতেছে।

আজকাল সাহিত্যের ভিতরে—বিশেষ করিয়া নাটক-উপন্যাসে—আমরা জীবনের সমস্যা চাই। এই সমস্যা কিন্তু নিছক কোন ব্যক্তির বা পরিবারের বা সঙ্কীর্ণ একটি গোষ্ঠীর হইলে, তাহা যতই সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত হোক্, এখন আর তাহাতে আমাদের মন ওঠে না। অবশ্য এই ব্যক্তি বা পরিবার শিল্পে সর্বত্রই সাধারণীকৃত; কিন্তু তথাপি এই সাধারণীকৃত রূপের উপরেও বিভাবাদির একটা ছায়া পড়েই। সাহিত্যে আজ তাই চাই জাতীয় সমস্যা—বৃহৎ সমাজের সমস্যা। ব্যক্তি সেখানে ব্যক্তি নয়, বৃহৎ সমাজের একটি অংশ—আবার বৃহৎ সমাজেরই প্রতীক।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সত্যটি অনুভব করিয়াছি—শুধু আজকার দিনের নূতন সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারেই নয়, পুরাতন সাহিত্যের আস্বাদনের ব্যাপারেও। এ-ব্যাপারে ব্যক্তিগত সাক্ষ্যও কিছু কিছু দিতেছি। কিছুদিন পূর্বে সেক্স্‌পিয়ারের ট্র্যাজেডিগুলি আর একবার পড়িতেছিলাম। খানিকটা পড়িতে পড়িতেই আস্বাদনের একটা স্পষ্ট তারতম্য লক্ষ্য করিতে পারিলাম। সেক্স্‌পিয়ারের নাটকীয় কলাকৌশল, বিশেষতঃ তাঁহার বচন-ভঙ্গির মহিমা মনকে পূর্বাপেক্ষা আরও যেন অভিভূত করিতে লাগিল, কিন্তু ঘটনা ও চরিত্রগুলি

পূর্বাপেক্ষা যেন অনেকখানি হাল্‌কা মনে হইতে লাগিল। পূর্বে নিজে বুঝিয়া হোক্, অথবা বিরাট বিরাট সমালোচকগণের নিরন্তর মন্ত্রণা-প্রসূত সংস্কারবশেই হোক্, সেক্স্‌পিয়ারের 'ট্র্যাজিক্ চরিত্র' বলিতেই কেমন একটা দ্বন্দ্বসঙ্কুল জীবনের রুদ্ধশ্বাস বাতাবরণের মধ্যে নিজেকে গভীর ভাবে অনুভব করিতাম; এখন যেন আর তেমনটি ঘটিতেছে না। 'হ্যাম্‌লেট্' পড়িতে বসিয়া খানিকদূর অগ্রসর হইয়াই মনে হইতেছিল, এত হুলুস্থুলু কিসের জন্য। হ্যামলেটের ব্যভিচারিণী মা তাহার পিতৃব্যের প্রেমে পড়িয়া সেই দুর্বৃত্ত পিতৃব্যের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাহার নিদ্রিত পিতার কানের ভিতরে বিষ ঢালিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। এখন এই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ একটি উপযুক্ত বীরপুত্র লইবে কি লইবে না, লইলে কিভাবে লইবে, ইহা লইয়াই যেন সৃষ্টি তোলপাড়! এই একটি নিছক পারিবারিক ক্লেদক্লিন্ন কারণকে অবলম্বন করিয়া যে ঘটনাবর্ত এবং বড় বড় কথা, তাহার সার্থকতা সম্বন্ধেও যেন মনে একটি সংশয় উঁকি মারিতেছিল। হ্যামলেটের প্রসিদ্ধ উক্তি—

> To be, or not to be,—that is the question :—
> Whether 'tis nobler in the mind to suffer
> The slings and arrows of outrageous fortune,
> Or to take up arms against a sea of troubles,
> And by opposing end them ?

এই কথাগুলি এবং ইহার সহিত যে চিত্তদ্বন্দ্ব-প্রকাশক আরও অনেক কথা রহিয়াছে, তাহা এখন আমার নিকট কেমন ম্লান লাগিতেছিল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল, আজকার দিনে এই কথাগুলি যেন পাই এমন একখানা নাটকের মধ্যে, যে নাটকের নায়ক স্বগৃহে অন্তরীন

একজন নেতাজী সুভাষচন্দ্র; ভবিষ্যতের সমস্ত সংগ্রামের দুঃস্বপ্ন লইয়া স্বদেশ হইতে পলায়নের পূর্বরাত্রে নিশীথের নিঃস্তব্ধ অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া বিড়বিড় করিয়া তিনি বলিয়া যাইতেছেন—To be, or not to be, that is the question!—অবশ্য বাস্তব দৃঢ়সঙ্কল্প সুভাষ-চরিত্রে এই জাতীয় চিন্তাবিজড়িত চিত্তদোলনীর অবকাশ ছিল কম, আমি শুধু একটি নাটকীয় অবস্থানের সম্ভাবনা-রূপেই জিনিসটির উল্লেখ করিতেছি। হ্যাম্‌লেট্‌ নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যখন দেখি ওফেলিয়াকে সমাধিস্থ করিবার জন্য একটি গির্জার প্রাঙ্গণে দুইটি লোক মাটি খুঁড়িয়া নর-কপাল তুলিতেছে এবং হ্যাম্‌লেট্‌ সেই নর-কপালগুলি হাতে করিয়া জীবনের ভবিষ্যৎ, জীবনের মূল্য সম্বন্ধে দার্শনিক সুরে বন্ধু হোরেসিওর নিকট কত কথাই না বলিতেছে, তখন আমার মনে হয় যে, আমার যুগে যদি আর একজন সেক্স্‌পিয়ার জন্মগ্রহণ করিতেন তবে তাঁহাকে একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করিতাম, যেখানে হিট্‌লার স্ট্যালিন্‌গ্র্যাডের শ্মশানভূমিতে আসিয়া বলে-বীর্যে, বুদ্ধিতে-চরিত্রে জার্মানীর শ্রেষ্ঠমণি সহস্র সহস্র যুবকের ভগ্ন কপাল হাতে করিয়া জীবনের ভবিষ্যৎ—জীবনের মূল্য সম্বন্ধে অর্ধোন্মত্ত দার্শনিক উক্তি করিতেছেন! সেক্স্‌পিয়ারের আর একটি প্রসিদ্ধ ট্র্যাজিক্‌ চরিত্র ম্যাক্‌বেথের সেই সুপ্রসিদ্ধ উক্তি—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools

The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing.

—প্রভৃতি পড়িয়া আজ মনে হয়, ম্যাক্‌বেথ্‌ যেন ঠিক জীবন সম্বন্ধে এতবড় কথা বলিবার যোগ্য অধিকারী নয়। যে লোক নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধিতে বৃহত্তর জনসমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, ঘৃণ্য স্বার্থপ্রণোদিত উচ্চাভিলাষের তাড়নায় যে লোক নিজের গৃহে অতিথি রাজাকে গুপ্তঘাতকের মতন হত্যা করিয়া রক্ষিদলের স্কন্ধে দোষ চাপাইবার ব্যবস্থা করে, নিজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার জন্য বন্ধু ও বন্ধু-পুত্রগণকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া পথিমধ্যে গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাহাদিগকে হত্যা করাইবার ব্যবস্থা করায়, জীবন সম্বন্ধে এ-জাতীয় গভীর উক্তিগুলি যেন তাহার মুখের ঠিক উপযুক্ত হয় নাই। জীবন-সম্বন্ধে এ-জাতীয় উক্তি যাহার মুখ হইতে বাহির হইবে, তাহার জীবনে আমরা অনেকখানি ব্যাপ্তির মহিমা চাই, সে ব্যাপ্তি-মহিমা বহুর সহিত একের যোগে।

উপরের সকল আলোচনা দ্বারা আমি সেক্স্‌পিয়ারের নাট্য-প্রতিভার সমালোচনা করিতেছি না; ইহা তাঁহার রচিত চরিত্রগুলির কোন দোষও ঠিক বলিতে পারিতেছি না; শুধু এইটুকু বলিতে পারা যায়, উপরে আমার যে সকল কথা মনে হইয়াছে তাহার সহিত যদি আরও অনেকের মতের সায় পাওয়া যায়, তবে যুগমানসের যে অনেকখানি তফাৎ ঘটিয়াছে এ-কথাটি স্বীকার করিতে হয়, এবং

সেই পার্থক্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার ইঙ্গিতটিও বিবেচ্য হইয়া ওঠে।

সেক্স্‌পিয়ারের কথা ছাড়িয়া দু'একটি ঘরের কথায় আসা যাক্‌। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকখানির দোষ-গুণ আর যাহাই থাক্‌, একটা কথা আগে সত্যই মনে বেশ দাগ কাটিত—তাহা যোগেশের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি—"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!" কিন্তু কিছুদিন যাবৎ এই উক্তিটি আমার নিকট কেমন ম্লান হইয়া আসিতেছিল; মনে হইত, একটি লোক নিজের অতিরিক্ত আত্মাভিমানবশে মদ খাইয়া মাতাল হইয়া রহিল, তাহার পরিবার উৎসন্নে গেল; দুঃখের বটে—কিন্তু কেমন যেন ছোট! আজ মনে হয়, এখন যদি আর একখানি নাটক রচিত হয়, যেখানে সমগ্র বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতির সহিত বহুকাল ধরিয়া নিজেকে সত্য সত্যই এক করিয়া লইয়াছেন এমন একটি যথার্থ মহৎ চরিত্র শিয়ালদহ স্টেশনে সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু শরণার্থীর দিকে তাকাইয়া ভগ্নবুকে শুষ্কচোখে আর্তনাদ করিয়া ওঠেন, "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল, আহা হা, আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!"—তবে এই উক্তিটি কি গভীর অর্থই না লাভ করিতে পারে!

সাহিত্যের ভিতরে তাই বড় চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া কোন দেবতা বা সদ্‌বংশজাত কোন রাজা মহারাজার চরিত্রের অবতারণা করিবার মত চিত্তভ্রান্তি আজকাল কখনও ঘটে না। বড় চরিত্র আমরা হয়ত এখনও কামনা করি, কিন্তু বড়ত্বের লক্ষণ বদলাইয়া গিয়াছে। বড় জীবন আমরা আজ বলি তাহাকে, যে জীবনের সহিত বহু জীবনের যোগ, যাহার সুখ-দুঃখের, আশা-নিরাশার সহিত

বহু জীবনের সুখ-দুঃখের, আশা-নিরাশার যৌথ
আমাদের সাহিত্যে বড় চরিত্র সৃষ্ট হয়, অথচ সে নেহাৎই আমাদের সাধারণ ঘরের ছেলে।

ইহাকেই বলিব আধুনিক সমাজ-চেতনা। সাহিত্যে হোক্, চিত্রে হোক্, সঙ্গীতে হোক্, নৃত্যে হোক্—ইহা আমাদের শিল্পবোধকে নিরন্তর নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। আমাদের শিল্পবোধের উপরে এই সমাজ-চেতনার একটি অনিবার্য প্রভাব এই, সমাজ-চেতনা শিল্পবোধকে কখনও অপ্রয়োজনের রত্নখচিত চূড়ায় সযত্নে রক্ষা করিতে দিতে পারে না,—তাহার দাবী শিল্পকে বহুর ভিতরে বিলাইয়া দিতে। কারণ, শিল্প যে এখানে জীবনের বিলাস নয়, শিল্প যে এখানে জীবনের সেবা। একজন নৃত্যকুশলীকেও তাই বার বার ভাবিতে হয়, আমার যাহা সেবার পথ তাহা দ্বারা বৃহৎ সমাজ-জীবনকে আমি কিভাবে সেবা করিব। যদি তাহা না করিয়া আমার শিল্পের তথাকথিত বিশুদ্ধি এবং আভিজাত্য আমাকে কেবলই ছুৎমার্গী করিয়া তোলে তবে শিল্প আমাকে বৃহৎ সমাজ-জীবন হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে, জীবনের সহিত একান্ত বিচ্ছেদে শিল্প এবং শিল্পী উভয়েরই ঘটিবে অপমৃত্যু।